মাইকেল মধুসূদন

জীবন-ভাষ্য

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
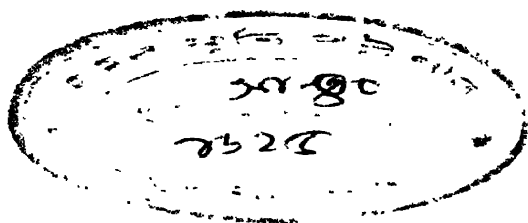
মিত্রালয়
১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ডি-লিট., এম. এ., বি. এল., ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল, এম. এল. এ.

মহাশয়কে শ্রদ্ধার সহিত

ভূমিকা

মাইকেল মধুসূদনের জীবনী লিখিবার ইচ্ছা বহুকাল হইতে ছিল; ১৩৪২ সালে খণ্ডিত আকারে এই জীবনীর কতক অংশ 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল; তারপরে ১৩৪৩-৪৫এ মাইকেল-জীবনী 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; এখন যাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইল—তাহার অধিকাংশই পুনর্লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ রচনায় আমি তিনখানি পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি। যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত'; নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি', আর শশাঙ্কমোহন সেনের 'মধুসূদনের অন্তর্জ্জীবন'।

মাইকেল সম্বন্ধে যতগুলি পুস্তক আছে (খুব বেশি নাই), তন্মধ্যে এক হিসাবে শশাঙ্কমোহন সেনের বইখানি শ্রেষ্ঠ; বোধ করি সে বই আর এখন কিনিতে পাওয়া যায় না; বাংলা শ্রেষ্ঠ বইয়ের শেষ আশ্রয়স্থল ফুটপাথে মাঝে মাঝে বিক্রয় হয়—আমি সেইখান হইতেই কিনিয়াছিলাম।

যোগীন্দ্রনাথ বসুর বইখানি সবচেয়ে লোকপ্রিয়, কিন্তু এক হিসাবে বসু মহাশয়ের বই মাইকেলের যে ক্ষতি করিয়াছে, তাহা প্রায় অপূরণীয় হইয়া উঠিবার মত হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের মধুসূদনের সঙ্গে পরিচয় এই বইখানির মারফতে—আর এই বইয়ের লেখক কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই যে, মধুসূদন হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন; এই 'ওরিজিন্যাল সিন' হইতেই মধুসূদনের কাব্যের সব অপূর্ণতা ও জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশার উদ্ভব—ইহা প্রমাণ করাই যেন বসু মহাশয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। মাইকেলের ব্যক্তিত্ব ও কাব্যের এত সহজ সমাধান করিলে চলিবে না। কিন্তু কোন সুপ্রতিষ্ঠিত পুস্তকের বিরুদ্ধে বোধ করি সত্য কথা বলা উচিত নয়। তবু এটুকু বলিতে বাধ্য হইলাম, তাহার কারণ, যদিচ আমি বসু মহাশয়ের সাহিত্যিক খ্যাতিকে সম্মান করি, তবু মধুসূদনের খ্যাতির প্রতি আমার আকর্ষণ ও সম্মান অধিকতর; বসু মহাশয়কে বাঁচাইতে গিয়া মধুসূদনের প্রতি অবিচার করিতে পারি না। বসু মহাশয় আজ আমার প্রতিবাদের উত্তর দিবার জন্য জীবিত নাই, কিন্তু তাঁহার গুণমুগ্ধেরা আছেন—তাঁহারা চেষ্টা করিতে পারেন।

তথ্য সংগ্রহের বিচারে নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের গ্রন্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এই বইখানির কাছে আমার ঋণ সবচেয়ে বেশি; এই একখানি বই অবলম্বন করিয়া মাইকেল সম্বন্ধে দশখানি জীবনচরিত লেখা চলিতে পারে।
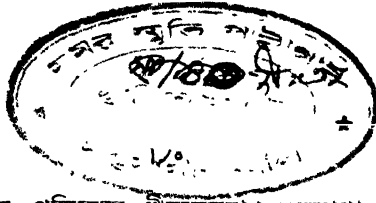
বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিবেদন শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রাপ্ত।

তথ্য সম্বন্ধে আমি প্রায় নিরঙ্কুশ, তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, জ্ঞানকৃত কোন ভুল এই গ্রন্থে নাই। শ্রীসজনীকান্ত দাস তথ্যের যাথাথ্য দেখিয়া দিয়াছেন—এ কৃতিত্ব তাঁহার প্রাপ্য; আর যদি কোথাও ভুল থাকিয়াই যায়, তবে অবশ্য গ্রন্থকার সেজন্য দায়ী।

তথ্য সম্বন্ধে এককালে আমরা যেমন শিথিল ছিলাম, আজকাল তেমনই সূক্ষ্মদর্শী হইয়াছি—দুইটির মধ্যেই বাড়াবাড়ি আছে। মধুসূদন ১৮২৩-এ জন্মিয়াছিলেন, কি ১৯২৪-এ জন্মিয়াছিলেন, তাহা লইয়া গবেষকের দল অনন্তকাল ধরিয়া তর্ক চালাইতে পারেন; কিন্তু তাহাতে মধুসূদনকে বুঝিবার দিকে তাঁহারা এক পা-ও অগ্রসর হইবেন না; এই জাতীয় তর্কের আড়ম্বর দেখিয়া যাঁহাদের মাথা শ্রদ্ধায় নুইয়া পড়ে—আমি সে দলের নই; কারণ আমি জানি যে, মধুসূদনের কাব্য বুঝিবার চেয়ে ওই জাতীয় তর্ক চালানো সহজ।

এই গ্রন্থে মধুসূদনের বাল্যকালকে বাদ দিয়াছি। প্রচলিত জীবনে এই সময়টাতে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখা যায়—একটি রামায়ণ-মহাভারতের প্রতি তাঁহার টান; দ্বিতীয়—পল্লীগ্রামে প্রাকৃতিক পরিবেশের আকর্ষণ।

রামায়ণ-মহাভারতের প্রতি আকর্ষণ কবির সারাজীবন ছিল, কাজেই বাল্যকালে বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ না করায় কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে করি না।

আর প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা যদি ওঠে, তবে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, বিশুদ্ধ প্রকৃতি, মানবসম্বন্ধহীন প্রকৃতি কখনও মধুসূদনের চিত্তকে আকর্ষণ করে নাই; মানবিক পরিবেশের অঙ্গ হিসাবেই প্রকৃতিকে তিনি দেখিয়াছেন; সাধারণত তাঁহার যে সব কবিতাকে (বিশেষভাবে সনেটগুলিতে) প্রকৃতির কবিতা বলিয়া মনে করি—সেগুলির অনুপ্রেরণার মূলে প্রচ্ছন্ন মানবিক পরিবেশ। ইহা সত্য হইলে তাঁহার পল্লীগ্রামের বাল্যজীবনকে বাদ দেওয়ায় কোন ক্ষতি হইয়াছে মনে হয় না।

এই গ্রন্থে নূতন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা নাই—পুরাতন তথ্যের নূতন ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র।

পাতায় পাতায় ফুটনোট দিয়া বইকে কণ্টকিত করা আমার ভাল লাগে না; তবে এই আশ্বাস পাঠককে দিতে পারি, ইহাতে তথ্য সৃষ্টি করিবার প্রয়াস হয় নাই; যে সব তথ্যের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা মধুসূদনের প্রচলিত কোন না কোন জীবন-চরিতে পাওয়া যাইবে।

মধুসূদনের ইংরেজী কাব্যের বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন। তাঁহার ইংরেজী

কাব্য, বাংলা কাব্য ও চিঠিপত্র মিলাইয়া যে জীবনী ভবিষ্যতে লিখিতে হইবে, তাহাই তাঁহার প্রকৃত জীবনী হইবে।

এই গ্রন্থে তাঁহার প্রচুর চিঠিপত্রের উদ্ধৃতি আছে; তাঁহার সব চিঠিই ইংরেজীতে; বাংলা অনুবাদ লেখকের; সর্ব্বত্র আক্ষরিক অনুবাদ করা হয় নাই, কিন্তু তাহাতে ভাবের ব্যতিক্রম হয় নাই।

কোন উদ্যমী গবেষক যদি মধুসূদনের আয়ব্যয়ের হিসাব আবিষ্কার করিতে পারেন, তবে তাহা খুব কৌতুহলকর হইবে।

ভবিষ্যতে মধুসূদন সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার জীবনীর কাঠামোর কোন পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র হইতে শ্রদ্ধেয় মোহিতবাবু ও বন্ধুবর বনফুল সকলেই শ্রীমধুসূদন লিখিয়াছেন, এহেন অবস্থায় আমি মাইকেল মধুসূদন লিখিলাম—ইহাকে কেহ কেহ বর্ব্বরতা মনে করিতে পারেন।

কিন্তু তাঁহারা মধুসূদনের কবিসত্তার পরিচয় দিতে বসিয়াছেন, তাই শ্রীমধুসূদন লিখিতে পারেন। আমি মধুসূদনের সমগ্র সত্তার পরিচয় দিতে বসিয়াছি—এই সমগ্রতার মধ্যে ভাল মন্দ, ছোট বড়, সব মিশিয়া আছে—তাহার মধ্যে মাইকেল শব্দটাও অন্যতম।

আমাদের দেশে জীবনী লিখিবার প্রধান অন্তরায় এই যে, ব্যক্তির প্রতি পৌত্তলিকতার ভাব। আলোচ্য ব্যক্তিকে আমরা দেবতা করিয়া তুলিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে সুবিশেষণের পুষ্পাঞ্জলি এত অধিক পরিমাণে দিই যে, তাঁহার মূর্ত্তি ঢাকিয়া যায়; ফলে তাঁহাকে বড় মনে হয়, কিন্তু আপন মনে হয় না; দেবতা মনে হয়, মানুষ মনে হয় না—আর দেবতার যে জীবনচরিত লেখা সম্ভব নয়, তাহা তো আমরা সকলেই জানি।

আমি মাইকেলকে দেবতা করিয়া তুলি নাই; তাঁহার দোষত্রুটি দেখাইয়া দিয়াছি—এমন কি তাঁহাকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপও করিয়াছি; ইহাতে তাঁহার অসম্মান হইয়াছে মনে করি না—বরঞ্চ ইহা দ্বারা তাঁহাকে মানুষ মনে করিয়া সম্মান দেখানোই যেন হইয়াছে; মানুষকেই ঠাট্টা করা যায়—ভালবাসা যায়; দেবতাকে ঠাট্টা করাও যেমন যায় না, তেমনই ভালবাসাও যায় না।

এই গ্রন্থে মধুসূদন ব্যক্তিটি কেমন ছিলেন—তাহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যার জন্য যে পরিমাণে তাঁহার কাব্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন—তাহাও করিয়াছি।

পাঠকের কেমন লাগিবে তাহা জানি না, তবে ব্যক্তি-মধুসূদন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে—তাহাতে মনে হয়, এই জীবনী মধুসূদনকে লাউডন ষ্ট্রীটের বাড়িতে

পড়িয়া শোনানো হইলে তিনি নিশ্চয় উচ্চহাস্যে উল্লাস প্রকাশ করিতেন; মাঝে মাঝে হাততালি দিয়া উঠিতেন; মিসেস ডি-কে ডাকিয়া শুনাইতেন; আর লেখক চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে বলিতেন—"Don't go away, man; boy, give him a peg."

এক সময়ে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মধুসূদনের যাতায়াত ছিল। মধুসূদনের মৃত্যুর সময়ে রবীন্দ্রনাথের বারো বছর বয়স; বারো বছর বয়সের স্মৃতি মনে থাকা উচিত ভাবিয়া রবীন্দ্রনাথকে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলাম যে, মাইকেল সম্বন্ধে কোন স্মৃতি তাঁহার মনে আছে কি না।

রবীন্দ্রনাথের উত্তর এখানে তুলিয়া দিলাম। রবীন্দ্রনাথ আজ আমাদের মধ্যে থাকিলে নিশ্চয়ই এই তুচ্ছ পত্রখণ্ড প্রকাশ করিতাম না; কিন্তু আজ তাঁহার তুচ্ছতম পত্রকেও অমূল্য বলিয়া মনে হইতেছে বলিয়াই প্রকাশ করিলাম।

"আমাদের বাড়িতে মাইকেলের গতিবিধির পরে আমার জন্ম। আমি তাকে দেখিনি। একবার প্রেতবাণীবহ চক্রযানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সেটা সাক্ষ্যরূপে আদালতে গ্রাহ্য হবে না।—ইতি ২১শে শ্রাবণ, ১৩৪৪।"

পরিহাসশীল পাঠক এই বই পড়িয়া হয়তো ভাবিতে পারেন যে, যে ভাবে এই জীবনী লিখিত হইয়াছে, তাহাতে প্রেতবাণীও গ্রন্থকার সাক্ষ্যরূপে উপস্থিত করিতে পারিতেন।

লেখকের যে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তাহা নয়।

মাইকেলের প্রেতভাষণ জানিতে পারিলে হয়তো কাজে লাগাইয়া দিতাম।

প্রায় গত দশ বছর ধরিয়া মাইকেলের ভূত আমার ঘাড়ে চাপিয়াছিল, আজ ছাপাখানার কালীয়দহে মুক্তিস্নান করিয়া উঠিলাম। আশা করি, এবারে মাইকেলের ভূত আমার ঘাড় হইতে নামিয়া পাঠকের ঘাড়ে চাপিবে।

শনিরঞ্জন প্রেসের সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্ম্মনিপুণতায় এ বই এত স্বল্পসময়ে সুচারু কলেবরে প্রকাশিত হইতে পারিল—তাঁহার নিকট এজন্য গ্রন্থকার ।

১১. ৯. ৪১

গ্রন্থপঞ্জী

মধুসূদনের গ্রন্থের কালানুক্রমিক এই তালিকা বাংলা সাহিত্যের প্রত্নাকর শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তুত করিয়া দিয়া গ্রন্থকারের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বাংলা

১। শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। ১৮৫৯। পৃ. ৮৪

২। একেই কি বলে সভ্যতা? ১৮৬০। পৃ. ৩৮

৩। বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ। ১৮৬০। পৃ. ৩২

৪। পদ্মাবতী নাটক। ১৮৬০। পৃ. ৭৮

৫। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। ১৮৬০। পৃ. ১০৩

৬। মেঘনাদবধ কাব্য, ১ম খণ্ড। ১৮৬১। পৃ. ১৩১
ঐ ২য় খণ্ড। ১৮৬১। পৃ. ১০৭

৭। ব্রজাঙ্গনা কাব্য। ১৮৬১। পৃ. ৪৬

৮। কৃষ্ণকুমারী নাটক। ১৮৬১। পৃ. ১১৫

৯। বীরাঙ্গনা কাব্য। ১৮৬২। পৃ. ৭০

১০। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী। ১৮৬৬। পৃ. ১২২

১১। হেক্টর-বধ। ১৮৭১। পৃ. ১০৫

১২। মায়া-কানন। ১৮৭৪। পৃ. ১১৭

ইংরেজী

I. THE CAPTIVE LADIE. Madras, 1849. pp. 65

2. RATNABALI. A Drama in four acts, Translated from the Bengali. 1858. pp. 57

3. SERMISTA: A Drama in five acts, Trans. from the Bengali by the Author. 1859. pp. 72

4. NIL DURPUN, or The Indigo planter's Mirror: A Drama trans. from the Bengali by A Native. With an Introduction by the Rev. J. Long. 1861. pp. 102

আদিকাণ্ড
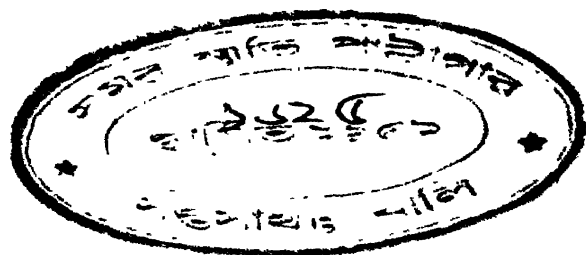
"যদি আমি মহাকবি হই, আর একবার ইংলণ্ডে যাইতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহা হইব, তখন তুমি আমার জীবনী লিখিও।"

"এইরূপ চুল ছাঁটিতে এক মোহর খরচ হইয়াছে।"
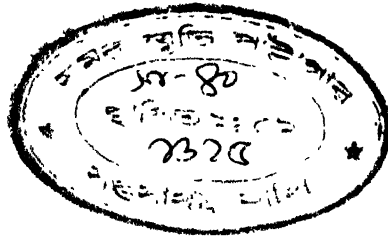
মাইকেল মধুসূদনের জীবন বৃটিশ-শাসিত বাঙালী-জীবনের একাধারে সূচনা ও উপসংহার। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে বাঙালী যে উল্লাস অনুভব করিয়াছিল, চতুর্থ পাদে যে ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যের স্বাদ একবার পাইয়াছিল এবং বিংশ শতকের মহাযুদ্ধের পরে যে ব্যর্থতা পদে পদে তাহাকে ব্যাহত করিতেছে, মাইকেলের জীবনে যেন অল্পদিনের মধ্যে, বহুদিন আগে, সেই লীলা অভিনীত হইয়া গিয়াছে। মাইকেল বাঙালীর ব্যর্থতার নীলকণ্ঠ।

এই আত্মার উল্লাস সেদিন অনেক বাঙালীই অনুভব করিয়াছিলেন—দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র; কিন্তু মধুসূদনের অপেক্ষা বেশি কেহ করেন নাই। ইঁহারা বাঙালীর জীবনের উষালোকের মানব; কিন্তু উষারও আগে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত; ইঁহাদেরও আগে রামমোহন; রামমোহন বাংলার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের বিরাট পুরুষ। ইউরোপের রেনেসাঁস-জীবনাদর্শকে মানব হিসাবে তিনিই প্রথমে গ্রহণ করিয়াছিলেন; আর সেই জীবনাদর্শকে মধুসূদন কবি হিসাবে প্রথমে গ্রহণ করিয়াছেন; রামমোহন নূতন বাংলার প্রথম মানুষ, আর মধুসূদন নূতন বাংলার প্রথম কবি।

সেইজন্যই মধুসূদনের জীবনের এক কোটিতে এই আত্মার উল্লাস—যে কোটিতে কাব্য-অনুপ্রেরণা, সাহিত্য-সৃষ্টি, কল্পনা-সমুদ্রে অধীর বিক্ষোভে অলক্ষ্য চাঁদের টানে বারংবার ফেনাইয়া উঠিতেছে; এই কোটির বাণী তাঁহার জীবনে বারংবার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—"মহাকাব্য সৃষ্টি করিব—মহাকাব্য সৃষ্টি করিব।"

কিন্তু মাইকেলের আর একটি জীবন ছিল, কিংবা একই জীবনের আর এক কোটি।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাষ্পীয় কলের বিপুল শক্তির আবির্ভাবে অভিনব একটা চিন্তার ধারা মানুষের মনে দেখা দিতেছিল। ইহা ক্রমে ব্যাপক হইতে হইতে

উনবিংশ শতকের শেষ পাদে প্রায় তত্ত্বের কোঠায় পৌঁছিয়াছিল, ইহাকে বলা যাইতে পারে—সম্পদ-তত্ত্ব; অর্থাৎ তখন সম্পদ আর কেবল ঐশ্বর্য্যমাত্র রহিল না, তাহা যেন একটা নৈতিক শক্তিরূপে পরিণত হইল। এ দেশেও এই নূতন সম্পদ-তত্ত্ব যথাকালে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, এবং মহাযুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

এখন এই সম্পদের মোহ নয়, তত্ত্ব মাইকেলের জীবনের অপর কোটিকে গ্রাস করিয়াছিল। এক দিকে তাহার আত্মার উল্লাস, অপর দিকে সম্পদের উল্লাস। এ ক্ষেত্রে মনে রাখিবার কথা এই যে, আর দশজন যে ভাবে সম্পদ কামনা করে, মাইকেল সে ভাবে কামনা করেন নাই; যতই আপাতবিরুদ্ধ হোক, এই দুই ভিন্নমুখী বাণী, আত্মার উল্লাস ও সম্পদের উল্লাস, তাঁহার জীবনে যেন সামঞ্জস্য খুঁজিতেছিল। সামঞ্জস্য খুঁজিতেছিল বটে; কিন্তু সমন্বয় কি ঘটিয়াছিল?

মাইকেল বলিতেন, বছরে চল্লিশ হাজার টাকার কমে ভদ্রভাবে জীবন-যাপন করা যায় না; তিনি চুল ছাটিয়া এক মোহর দিতেন; না গুনিয়া মুঠা করিয়া টাকা (অনেক সময়েই পরের টাকা) কোচম্যানকে বকশিশ দিতেন, ব্যারিস্টার হইয়া আর দেশী পাড়ায় বাস করিলেন না; প্রয়োজন হইলে এবং না হইলেও ধার করিতেন। ইহা কি কেবল মোহ, না ইহার মূলে কোন তত্ত্ব আছে?

"মেঘনাদবধ কাব্যে'র রামলক্ষ্মণের প্রতি মাইকেল যেন অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, বড়জোর তাহাকে কৃপা বলা যাইতে পারে; কবি-মনের সমস্ত সহানুভূতি রাবণের দিকে; তাহার কারণ রামলক্ষ্মণ দরিদ্র, ঐশ্বর্য্যহীন; আর রাবণ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; কবি-কল্পনা—মাইকেলের রাজসিক কল্পনা ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা রাখে; রামের দিকে সে সুবিধা নাই, রাবণের দিকে আছে; যে রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা, তাঁহাকে পাইলে মাইকেল সম্পূর্ণ সহানুভূতিতে অঙ্কিত করিতেন; কিন্তু এ যে বিত্তহীন নিঃস্ব রামচন্দ্র; মাইকেলের কল্পনা রামের দিকেও নয়, রাবণের দিকেও নয়, ঐশ্বর্য্যের দিকে। এই ঐশ্বর্য্য-তত্ত্ব তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। বাল্যকাল হইতে ইংলণ্ডে যাইবার ইচ্ছার মূলে ঐশ্বর্য্যলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তিনি বলিতেন বটে, মহাকবি হইবার জন্য ইংলণ্ডে যাওয়া তাঁহার প্রয়োজন; কিন্তু ব্যারিস্টার হইবার জন্য তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তাই তাঁহার জীবনের আর একটি ধুয়া—"ইংলণ্ড কতদূর! ইংলণ্ড কতদূর!"

আমরা দেখিলাম, মাইকেলের জীবনের এক কোটিতে আত্মার উল্লাস, আর এক কোটিতে সম্পদের উল্লাস; কিন্তু এই দুই কোটির মধ্যে কি কোন যোগসূত্র নাই? তিনি কল্পনা ও ঐশ্বর্য্যকে পরস্পরবিরোধী মনে করিতেন না; একটি আর একটির অপেক্ষা রাখে; একটি না হইলে আর একটি পঙ্গু হইয়া পড়ে।

শিল্পীর পক্ষে সম্পদ শুধু প্রয়োজন নয়, অত্যাবশ্যক। স্বয়ং বিশ্বশিল্পী মনের ভাবকে প্রকাশের জন্য জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। মানব-শিল্পীর পক্ষে তেমনই আগে বস্তুকে আয়ত্ত করা দরকার। বস্তুকে, ঐশ্বর্য্যকে অবলম্বন করিয়াই যেন ভাবুকের ভাব মূর্ত্তি গ্রহণ করে; কাজেই বস্তুবিহীন ঐশ্বর্য্যহীন শিল্পীর অস্তিত্ব যেন কল্পনাই করা যায় না। বস্তুর মধ্যেই যেন ভাবুকের ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে—বস্তুই যেন ভাবুকের ব্যক্তিত্ব।

মাইকেল শিল্পসৃষ্টির জন্যই ঐশ্বর্য্যের কামনা করিতেন—ঐশ্বর্য্যের জন্য ঐশ্বর্য্য নয়। কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য্য ও আত্মার মধ্যে সমন্বয়-সাধন করিতে পারেন নাই, ঐশ্বর্য্যের উল্লাস ও আত্মার উল্লাস, মূলত যাহা পরস্পর-বিরোধী নয়, মাইকেলের জীবনে তাহা সুগম হইয়া উঠে নাই। দুইটি ভিন্ন সুরে তাহার হাতে ঐকতান বাজিয়া উঠিল না। এই দুই কোটির মধ্যে জ্যা আরোপ করিতে গেলে বিশাল হরধনু ভাঙিয়া পড়িল; মাইকেলের জীবনের সাধনা ব্যর্থ হইয়া গেল। ইহাই মাইকেলের জীবনের ট্রাজেডি। তাঁহার জীবনের দুইটি ধুয়া—দুইটি মিলিয়া একটি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হইতে পারে নাই; এই দুই ধুয়া তাঁহার জীবনে ভিন্ন কণ্ঠে অবিরাম ধ্বনিত হইতেছে—মহাকাব্য কতদূর! ইংলণ্ড কতদূর!

গোলদীঘির ধারে, হিন্দু কলেজের সম্মুখে একদিন টিফিনের ছুটিতে দুইটি বালক আলাপ করিতেছিল। দুইজনের বয়স সমান, একজন গৌরবর্ণ, একজন কালো। গৌরবর্ণ ছেলেটি নীরবে নতমুখে বিষণ্ণ-ভাবে বসিয়া, আর কালো ছেলেটি তাহার কাঁধে হাত দিয়া দণ্ডায়মান। কালো ছেলেটি বলিল, তুমি নাকি পড়া ছেড়ে দিচ্ছ?

গৌর বালকটি উত্তর করিল, জান তো ভাই, কত মাইনে বাকি পড়েছে, বাবা ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ, এত টাকা দিতে পারবেন না, কাজেই—

প্রশ্নকারী তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, আমি তো অনেক টাকা পাই, আমার কাছ থেকে তুমি নাও না কেন?

'টাকা' শব্দটি উচ্চারণের সময় বালকের জিহ্বা সরস হইয়া উঠিল, যেন সে মনে মনে টাকা শব্দটির স্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। আমরা যথাসময়ে দেখিব, বালকের পরবর্ত্তী জীবন এই টাকার কেন্দ্রেই আবর্ত্তিত হইয়াছে, কিংবা তাহার পরবর্ত্তী ধর্ম্ম-জীবন মনে রাখিলে বলিতে ইচ্ছা করে, তাহার আধ্যাত্মিক জীবনকে সে বলিদান দিয়াছে এই টাকার ক্রুশ-কাষ্ঠে।

এমন সময় আর একটি বালক সেখানে আসিল; সে কালো ছেলেটির চুল লক্ষ্য করিয়া বলিল, একি মধু, এ কেমনধারা চুল ছাঁটা!

মধুসূদন যেন আজ সারাদিন এই কথাটি শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, হাঁ ভাই, এ সাহেবী ধরনে চুল ছাঁটা—এক মোহর লেগেছে।

গৌরবর্ণ বালকটি এতক্ষণ তাহার কেশবিন্যাস দেখে নাই; এবার দেখিয়া বলিল, মধু, এ তোমার উপযুক্ত কাজ হয় নি। তুমি জিনিয়াস, তুমি সাহেবদের বৃথা অনুকরণ না ক'রে একটা নূতন ধরনে চুল ছাঁটবে—এই তো আমরা আশা করি।

মধু ইহাতে মোটেই দমিল না। কোথা হইতে কোন্ জিনিসটি সংগ্রহ করিতে হয় (অবশ্য টাকা সর্ব্বত্র হইতে), তাহা সে বেশ জানে। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন পায়ের তলায় মাটি পাইলে তাহার উপর সমস্ত শক্তি দিয়া দাঁড়ায়, মধু তেমনই এই ভর্ৎসনার মধ্যে 'জিনিয়াস' শব্দটির উপরে আপনাকে স্থাপন করিয়া সঙ্গীদের অপেক্ষা নিজেকে উচ্চতর মনে করিতে লাগিল।

সে নবাগত বালককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, গৌরদাস, আমি একজন মহাকবি হব, তুমি আমার জীবনী লিখবে। আমি জানি, নিশ্চয় আমি মহাকবি হব। তারপরে একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কেবল যদি একবার ইংলণ্ডে যেতে পারি! এই বলিয়া সে হাত নাড়িয়া বলিল—**I sigh for Albion's distant shore!** সে ইতিমধ্যেই ইংরেজী বাচনভঙ্গি যতদূর সম্ভব ইংরেজদের মত বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

এই বালকের পূরা নাম মধুসূদন দত্ত; গৌরবর্ণ বালকটি ভূদেব মুখোপাধ্যায় আর আগন্তুক গৌরদাস বসাক।

মধুসূদনের রং কালো; শুভ্র চাপকান ও ইজার পরাতে সাদা-কালোর দ্বন্দ্বে তাহাকে কৃষ্ণতর মনে হইতেছিল। রং কালো হইলেও মুখশ্রী দেখিয়া মনে হয়, ভিতর হইতে প্রতিভার দ্যুতি ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে, যেন কালো মেঘের তলে চাপা-পড়া সূর্য্য। চুল ঈষৎকুঞ্চিত, মাঝখানে সরল সিঁথি। বড় বড় ভাসা ভাসা উদার অচঞ্চল চোখ দুইটি যেন অত্যন্ত বিশ্বাসের সহিত নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহাতে সন্দেহের ছায়ামাত্র নাই। সবসুদ্ধ মিলিয়া তাঁহার রং, স্বাভাবিক কালো ও পোশাকের সাদা, বড়ই স্নিগ্ধ এবং তরল।

মধুসূদন বালক-কাল হইতেই উদার এবং স্নব; স্নব-এর প্রতিশব্দ বাংলায় নাই, কারণ বাস্তবে এতই আছে।

মধুসূদন হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র—শুধু প্রতিভায় নয়, পয়সাতেও নয়—কারণ কলিকাতার ধনীর সন্তানেরা সেখানে পড়িত, মধুসূদনের শ্রেষ্ঠত্ব পয়সার ব্যবহারে। ঐশ্বর্য্যের পেখম কি করিয়া বিস্তার করিয়া দিতে হয়, তাহা যেন মধুর সহজাত বিদ্যা।

তিনি প্রতিদিন খিদিরপুর হইতে পাল্কি করিয়া কলেজে আসিতেন; সঙ্গে থাকিত জন দুই ভৃত্য আর কয়েক রকম বিভিন্ন পোশাক; কলেজে তিনি বার দুই পোশাক পরিবর্ত্তন করিতেন।

একদিন তিনি ধুতি-চাদর ছাড়িয়া বুট-ট্রাউজার ও আচকান পরিয়া আসিয়া উপস্থিত। তাহার পরেই ইংরেজী কোর্ত্তা ধরিলেন—এ পোশাক আর জীবনে পরিত্যাগ করেন নাই।

তাহার দেখাদেখি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে উড়নি-হীন একসুটের একটি দল গড়িয়া উঠিল; উড়নি ত্যাগীরা আঁটো কোর্ত্তা গায়ে দিয়া সগৌরবে চলাফেরা করিতে লাগিলেন।

কলেজে মধুর সবচেয়ে প্রিয় ছিল ইংরেজী সাহিত্য ও ইংরেজীর অধ্যাপক কাপ্তেন রিচার্ডসন। তিনি ইংরেজীর ঘণ্টায় কখনও অনুপস্থিত থাকিতেন না; শুধু যে সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইতেন তাহা নয়, সকলের অগ্রণীও ছিলেন বটে।

কাপ্তেন রিচার্ডসন কলেজের ছাত্রদের সাহিত্য-বিষয়ে আদর্শ ছিলেন; তিনি ছাত্রদিগকে ইংরেজী সাহিত্যের রস গ্রহণে সাহায্য করিতেন; যাহারা ইংরেজীতে রচনা করিত, তাহাদের রচনা সংশোধন করিয়া দিতেন এবং বিশিষ্ট ছাত্রদের কবিতা নিজের সম্পাদিত 'লিটারারি গ্লীনার' কাগজে ছাপিতেন। মধু তাহার প্রিয় ছাত্র, মধুর অনেক সনেট তিনি নিজের কাগজে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গণিতশাস্ত্রে মধুর বড় অনুরাগ ছিল না; কবিত্ব ও গণিতের পারদর্শিতা নাকি একসঙ্গে চলে না। ইহা নাকি সর্ব্বজনস্বীকৃত অতি প্রাচীন প্রথা। কিন্তু আমার তো মনে হয়, কবিত্বের প্রধান অংশটাই গণনা-মূলক; কিংবা হয়তো সেইজন্যই আত্মঋণ গোপন করিবার উদ্দেশ্যেই কবিরা গণিতের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, মধুর এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবার সাহস হয় নাই। তিনি গণিতের ঘণ্টায় সংস্কৃত কলেজের একতলার হলে আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন এবং গণিতের নীরসতাকে সরস করিয়া তুলিবার জন্য মাঝে মাঝে বন্ধুদের লইয়া নিকটের হিন্দু হোটেলে গিয়া মুর্গীর মাংস ভোজন করিয়া আসিতেন।

মধু যে অঙ্ক পারিতেন না, তাহা নয়; অন্তত তাহা মধুর মত গর্ব্বিত-স্বভাব ব্যক্তির পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব নয়; অঙ্ক তিনি পারিতেন কিন্তু কষিতেন না, কারণ

কবিরা অঙ্ক কসিতে পারে কিন্তু কষে না। একদিন ভূদেবের সঙ্গে মধুর তর্ক বাধিল, কে বড়—নিউটন না শেক্সপীয়র? ভূদেব বলিলেন, নিউটন; মধু, শেক্সপীয়র। মধুর মতে শেক্সপীয়র ইচ্ছা করিলে নিউটন হইতে পারিতেন, কিন্তু নিউটন ইচ্ছা করিলেও শেক্সপীয়র হইতে পারিতেন না। প্রমাণ কি? প্রমাণ হইল অসম্ভাবিত এক নূতন উপায়ে।

সেদিন গণিতের ক্লাসে দুরূহ একটি অঙ্ক কেহই সমাধান করিতে পারিল না—ভাবী নিউটনের দল নীরব। তখন ভাবী শেক্সপীয়র মধু উঠিয়া গিয়া অঙ্কটি কসিয়া সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন, প্রমাণ হয়ে গেল—শেক্সপীয়র ইচ্ছা করলে নিউটন হ'তে পারেন।—কিন্তু আমার অঙ্ক কষা এই পর্যান্তই।

কলেজে বাকি সময়টা মধুসূদন সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চা দুই রকমের; তিনি লাইব্রেরি-ঘরের এক কোণে বসিয়া একমনে রিচার্ডসন সাহেবের আঁকা-বাঁকা হাতের লেখার নকল করিতেন। একদিন 'কার' সাহেব ইহা দেখিয়া মধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মধু, এ কি হচ্ছে? তুমি কি মনে কর, কাপ্তেনের মত হাতের লেখা করতে পারলেই তাঁর মত পণ্ডিত হ'তে পারবে? মধুর উত্তর আমরা জানি না, কিন্তু এত সহজে যে তাঁহার ভুল ভাঙিয়াছিল বিশ্বাস হয় না।

মধুর সাহিত্য-চর্চ্চার প্রধান অংশ ছিল স্বরচিত রচনা পাঠ। মধু নিজের লেখা গদ্য পদ্য পড়িয়া যাইতেন, আর তাঁহার পার্শ্বচরগণ—ভূদেব, গৌর, বঙ্ক, ভোলানাথ নির্ব্বিচারে শুনিয়া তারিফ করিতেন। এখানে ভোলানাথ চন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত হইল :—

Madhu has taken up to describe a night scene, in which, among other things, he thus alludes to the stars, 'Night holds her Parliament.'...Shakespeare has 'the floor of heaven is thick-inlaid with patines of gold.' Byron addresses them 'poetry of Heaven.' Madhu, in his teens, gives a proof of close poetic kinship."

এক নিশ্বাসে শেক্সপীয়র হইতে বায়রন, এবং তাহার পরেই মধুসূদন! ইহাই ছিল সে যুগের, বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষার সত্যযুগের, সাহিত্যিক সমালোচনা।

এই সময়ে মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত খিদিরপুরে নিজের বাড়িতে থাকিতেন; মধু পিতার সঙ্গে থাকিতেন।

তিনি সকালে শয্যাত্যাগ করিয়া চা-পান করিতেন ও কলেজে যাইবার আগে অবধি নিজের লেখাপড়া লইয়া থাকিতেন; বিশেষ সেদিন কলেজে গিয়া বন্ধু-বান্ধবকে যে রচনা শোনাইবেন, সেগুলির চরম সংশোধন করিতেন।

কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে ছাদের উপরে সভা বসিত। দুইচারজন বন্ধু-বান্ধব আসিতেন; কাব্যপাঠ চলিত; বায়রন এবং বিশেষভাবে তৎকৃত ডন জুয়ান; এই সময় হইতেই শয়নের পূর্ব্বে এক গেলাস মদ পান করিবার অভ্যাস তাঁহার হইয়াছিল। শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, একখানা মোটা চাদরে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া তিনি শয্যা-গ্রহণ করিতেন।

তখনকার খিদিরপুর নিভৃত পল্লীমাত্র ছিল, কাজেই মধুর বাড়ি সদররাস্তার উপরে হইলেও নিস্তব্ধ ছিল। তিনি কদাচিৎ বেড়াইতে বাহির হইতেন; বন্ধু-বান্ধব তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন, তিনি বড় যাইতেন না। সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে ছাড়া অর্দ্ধপরিচিত ও অপরিচিত লোকের সঙ্গে মিশিতে পারিতেন না। বন্ধুরা আসিলে ছাদের উপরে সন্ধ্যাবেলা কাব্যপাঠ চলিত, মাঝে মাঝে গান চলিত; তিনি নিজে ফারসী গজল গাহিতেন; এ সময়ে তাঁহার কণ্ঠ মধুর ছিল—পরবর্ত্তী কালে কণ্ঠের মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

একদিন চাঁদনী রাত্রে মধু বাড়ির ছাদের উপরে বসিয়া ছিলেন, এমন সময়ে পথ দিয়া একজন লোক বাঁশী বাজাইয়া যাইতেছিল। বাঁশীর করুণ সুর মধুর হৃদয় স্পর্শ করিল—তিনি উন্মনা হইয়া উঠিয়া কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে পায়চারি আরম্ভ করিলেন।

এই সময় মধুর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না—কাজেই তিনি মিতাহারী ছিলেন। তাঁহার এক বন্ধু বলেন, তাঁহার মদ্যপানের অভ্যাস থাকিলেও নারী-বিষয়ে তিনি নির্দ্দোষ ছিলেন; বন্ধুদের মধ্যে নারী-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হইলে তিনি তাহাতে যোগ দিতেন না। সাহিত্যের আলোচনাতেই তাঁহার উৎসাহ ছিল বেশি।

মধু মাঝে মাঝে কলেজের বন্ধুদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিতেন। মধুর পিতামাতা পুত্রের বন্ধুগণকে পুত্রের মত স্নেহযত্ন করিতেন। সেদিনের কথা বলিতেছি, সেদিন অন্যান্য বন্ধুরা ছাড়া গৌরদাস বসাক ও ভোলানাথ চন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। মধুর পিতা আলবোলায় ধূমপান শেষ করিয়া নলটি পুত্রের হাতে তুলিয়া দিলেন, মধু ধূমপান করিতে লাগিলেন। পরে গৌরদাস ইহা কেমনধারা ব্যবহার জিজ্ঞাসা করিলে মধু বলিলেন, আমার পিতা তোমাদের সামাজিক ওসব তুচ্ছ আচার গ্রাহ্য করেন না।

রাজনারায়ণ দত্ত নিজেই পুত্রের যথেচ্ছাচারের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছিলেন; কিন্তু মধু যখন সে পথে পিতার ঈপ্সিত সীমাকে অতিক্রম করিয়া গেলেন, তখন পিতার

চোখ ফুটিল। কোন বিশেষ ধারাকে মানুষে অনায়াসে আরম্ভ করিয়া দিতে পারে, কিন্তু সেই ধারা যখন নিজের সত্তায় সঞ্জীবিত হইয়া চলিতে আরম্ভ করে, তখন আর মানুষে তাহাকে থামাইতে পারে না। ইহাই সংসারের পরিহাস।

সেদিন আহার্য্যের মধ্যে পোলাও-এর ব্যবস্থা ছিল। বৈষ্ণবপরিবারের গৌরদাসের সেদিন প্রথম ছাগমাংস আস্বাদন। আর ভোলানাথও বহুদিন পর্য্যন্ত সে পোলাও-এর স্বাদ ভুলিতে পারেন নাই—কারণ—"His pilao was the czar of dishes"—চন্দ্র মহাশয় শুধু ইংরেজী নয়, ইতিহাসও জানিতেন! স্বাদু আহার্য্যের বর্ণনা উপলক্ষ্যে ইতিহাস, সাহিত্য ও খাদ্যতত্ত্বের এমন খিচুড়ি প্রায় দেখা যায় না—ইহাকেই বোধ হয় জগাখিচুড়ি বলে!

জীবনকে রঙ্গমঞ্চ বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহার নেপথ্য কোথায়? জীবনের মধ্যেই কোথাও আছে নিশ্চয়ই, তবু চোখে পড়িতে চায় না। সাধারণ লোক জীবনের রঙ্গমঞ্চের যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তাহার সঙ্গে নেপথ্য-বিধানের বড় প্রভেদ নাই। রঙ্গমঞ্চেও তাহারা কেরানী, ইস্কুল-মাস্টার, ভৃত্য এবং ভিখারী, নেপথ্যেও; আচার ব্যবহার পোশাকে, কথাবার্ত্তায় প্রভেদ এতই কম যে, দুই জায়গাতেই প্রায় তাহাদের এক রকম মূর্ত্তি; পার্থক্য চোখে পড়ে না; কাজেই আমরা নেপথ্যের কথা এক রকম ভুলিয়া থাকি।

মাঝে মাঝে দুইচারজন অসাধারণ ব্যক্তি আসেন, যাঁহাদের রঙ্গমঞ্চের মূর্ত্তি আর নেপথ্যের মূর্ত্তিতে ভেদ অনেক; এই বৈচিত্র্যের রহস্য আমরা বুঝি না; তাই তাঁহাদের কেহ বলে ভণ্ড কেহ বলে অভিনেতা; আর এই দুইটি কথাই একার্থবাচক, কারণ অভিনেতা ভণ্ড বইকি। তবে তাহাদের ভণ্ডামি নির্দ্দোষ, উদ্দেশ্যহীন।

মধুসূদন এই রকম একজন অসাধারণ ব্যক্তি; তাঁহার দীপোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চের মূর্ত্তি ও অপেক্ষাকৃত ম্লান নেপথ্য-কক্ষের মূর্ত্তিতে মিলিতে চায় না; আমরা ভাবি, লোকটা কি রকম! লোকটা এক মুখে কত কথাই না বলিতেছে! আবার বলে এক, করে আর; ইহাকে বুঝিয়া উঠা মুশকিল; রাগিয়া বলি লোকটা, কিন্তু মনে রাখা কি খুবই কঠিন যে যাহা কিছু প্রভেদ, তাহা সাজপোশাকের, ভাবভঙ্গির, কথাবার্ত্তার; কিন্তু এসবের তলে লোকটা একই!

এতক্ষণ মধুকে যে ভাবে দেখিয়াছি, সে ওই রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা; সহস্র চক্ষুর দীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে, করতালি-মুখরিত প্রেক্ষাগৃহের ভূমিকায় অবতীর্ণ মধুসূদন। এবারে তাঁহার নেপথ্য-মূর্ত্তি দেখা যাক।

মধু বন্ধু গৌরদাসকে লিখিতেছেন—

"আমার দিন বড় অশান্তিতে কাটিতেছে; মা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তারপরে কলেজের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে একজন আজ প্রায় চার দিন হইল মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আমি গত চার রাত্রির মধ্যে একবারও চোখের পাতা বন্ধ করি নাই।"

কয়েকদিন পরে আবার—

"অভাবিতপূর্ব্ব আকস্মিক এক বিপদে আমি মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছি। আমার এক আত্মীয় মারাত্মক ব্যাধিতে শায়িত, সত্য কথা বলিতে কি, ব্যাধির শেষ অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার ব্যাধির যন্ত্রণায় আমার মন বড় বিষণ্ণ।"

মধুসূদনের এ চিত্র দর্শনে আমরা অভ্যস্ত নই। তাঁহার জীবনের শেষ ব্যাধিতে দেখিয়াছি, বন্ধু-বান্ধব তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু তিনি নিজেও একদিন যে যৌবনের প্রগল্‌ভতার মধ্যে চার রাত্রি অনিদ্র থাকিয়া মুমূর্ষু আত্মীয়ের শিয়রে বসিয়া ছিলেন—ইহা কেমন যেন বিস্ময়ের বলিয়া বোধ হয়। বিস্ময়ের তো বটেই, কারণ এ মানুষ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা নয়, নেপথ্যের আত্মীয়।

কিন্তু জন্ম-অভিনেতা মধুসূদন কি বেশিক্ষণ নেপথ্য-গৃহে থাকিতে পারেন? পতঙ্গের পক্ষে যেমন দীপালোক, অভিনেতার পক্ষে তেমনই পাদপ্রদীপালোক; নেপথ্যের অন্ধকার তাহাদের কাছে বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বেকার অন্ধকার। স্বয়ং বিশ্ববিধাতা চরম ও আদিম অভিনেতা; একদা তিনি নেপথ্য-কক্ষের অন্ধকারে বিরক্ত হইয়া—'Let there be Light' বলিয়া সহস্র সূর্য্য-চন্দ্র-তারার উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের সারি জ্বালাইয়া দিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মধু লিখিতেছেন—

"আমি যাইতেছি, যশোহরে নয়, আমার পিতার এক সম্ভ্রান্ত বন্ধুর বাড়িতে। তিনি তমলুকের রাজা।"

যে ঐশ্বর্য্যকে মধু আজীবন আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এই রাজ-নিমন্ত্রণে যেন তাহারই স্বাদ পাইয়া মধু উল্লসিত। আবার কয়েক ছত্র পরেই—

"গত মঙ্গলবারে আমার কয়েকটি কবিতা ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিনের সম্পাদকের নামে পাঠাইয়াছি। কবিতাগুলি তোমার নামে উৎসর্গ করি নাই—করিয়াছি উইলিয়াম ওয়ার্ডস্বার্থের নামে।"

মধু যে ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতার ভক্ত ছিলেন এমন পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁহার খ্যাতিকে তিনি অগ্রাহ্য করেন কেমন করিয়া। ঐ রাজার মধ্যে ঐশ্বর্য্যটা যেমন লোভনীয়—এখানে কবির মধ্যে তেমনই তাঁহার খ্যাতি। মধু তো ওই দুটি বস্তুরই কাঙাল।

আর একখানি পত্রে তিনি বলিতেছেন, "তমলুকের মত জঘন্য স্থানে মানুষে আসে!" আবার সান্ত্বনার কারণও খুঁজিয়া পাইয়াছেন; মধু সেই সমুদ্রের কাছে আসিয়াছেন, যে সমুদ্র একদিন তাঁহাকে ইংলণ্ডের অভিমুখে লইয়া যাইবে। আর সে দিনও বেশি দূরে নয়। কলিকাতা ছাড়া ভাল কাজ হয় নাই, তবু সান্ত্বনা এই—খানিক পরিমাণে ইংলণ্ডের কাছে আসা গিয়াছে। কলিকাতা হইতে তমলুকের দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল।

একখানি পত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

"একটা কথা দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি, যেটুকু ইংরাজী জানিতাম, তাহার অর্দ্ধেক ভুলিয়া গিয়াছি এবং কবিতা লিখিবার যে সামান্য শক্তি ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গিয়াছে। একটা বিষয়ে কবিতা লিখিতে গিয়া দেখি যে, চার ঘণ্টায় এক ছত্রও লিখিতে পারিলাম না। হয় আমার কাব্যলক্ষ্মীকে তোমার কাছে ফেলিয়া আসিয়াছি, নতুবা তিনি অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। আমার দিন শেষ হইয়াছে ভাবিও না, আমার বিশ্বাস কাব্যলক্ষ্মী তমলুকের মত স্থানে আসিতে দ্বিধা বোধ করেন। কলিকাতায় গিয়া দেখিও কবিতা লিখিয়া তোমাকে একেবারে ডুবাইয়া দিব।"

এ কোন্ মধুসূদনের উক্তি? অভিনেতার, না নেপথ্যচারীর? বোধ হয় যুগপৎ উভয়েরই।

সকল প্রকৃত কবিরই মাঝে মাঝে এই রকম সন্দেহ উপস্থিত হয়—বোধ হয় আর কবিতা লিখিতে পারিব না। কাব্যলক্ষ্মীর রহস্য সম্পূর্ণরূপে তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না; তাঁহার গতিবিধির উপর তাঁহাদের কর্তৃত্ব নাই। সত্যকার কবিরা সত্যই অসহায়। অবশ্য যান্ত্রিক কবিরা ঘড়ি ধরিয়া কবিতা লিখিতে পারেন; কাব্যলক্ষ্মীর উপরে বিশ্বাস রাখিলে তাঁহাদের চলে না।

কলিকাতার শান-বাঁধানো মাটিতে ঘাস গজাইতে পারে না, কিন্তু বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের জন্ম কলিকাতাতেই। বিশেষ, মধুসূদনের কাব্যপ্রেরণা কলিকাতার বাস্তব জীবন, কলিকাতার বন্ধুদের সাহচর্য্যের অপেক্ষা রাখে। কলিকাতা ছাড়িলে তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী মূক, কলিকাতায় ফিরিলেই তিনি আবার মুখর। মধুসূদনের সকল শ্রেষ্ঠ কাব্যই কলিকাতার ফসল।

মধুর বন্ধুপ্রীতি প্রবাদে পরিণত হইয়াছে; ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। কিন্তু বন্ধুর জন্য স্বার্থত্যাগ অনেকেই করিতে পারে, করিয়াছেও; মধুসূদন আরও একটু অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। তিনি গৌরদাসকে লিখিতেছেন—

"আমি ইংলণ্ডে যখন যাইব, আশা করি সে সময় বেশি দূরবর্ত্তী নয় (আগামী শীতকালে), আমি স্থির করিয়াছি, তোমার একখানি ছবি সঙ্গে লইব, তাহাতে খরচ যতই পড়ুক; তোমার একখানি ছোট ছবির জন্য—আমার পোশাকগুলি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে রাজি।"

এই সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইবার কিছু নাই; মধুও জানিতেন, গৌরদাসও জানিতেন, আমরাও জানি, ছোট্ট একখানি ছবি অঙ্কিত করিবার জন্য তাহার কিছুই বেচিতে হইবে না—মধুর যথেষ্ট টাকা ছিল। তাঁহার ভাবটা, পোশাক বেচিতে হইবে না সত্য বটে, তাই বলিয়া বিক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে ছাড়িব কেন? বড় রকম স্বার্থত্যাগ করিবার সুযোগ সংসারে বড় আসে না, তাই বলিয়া কলমের মুখেও আসিবে না?

মধুর বন্ধুপ্রীতি অসাধারণ, কিন্তু তাহা ইংরেজী ব্যাকরণে শ্রদ্ধার চেয়ে বড় নয়। বেচারা গৌরদাস একখানি পত্রে 'দি শেক্সপীয়র' লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। একে ইংরেজী ব্যাকরণে ভুল—তাহাতে স্বয়ং শেক্সপীয়রের নামে!

মধুসূদন লিখিতেছেন—

"গৌর, তুমি আমার ছাত্র হইলে তোমাকে বেত মারিতাম। নামের আগে কখনও 'দি' 'এ' বসে না। ভবিষ্যতে সাবধান!"

ইংরেজী ব্যাকরণের প্রপার-নাউনের বিধি ও ইংলণ্ডের কাব্য, বন্ধুদের প্রীতি ও রাজকীয় ঐশ্বর্য্যের লোভের ঘাটে ঘাটে মধুসূদনের জীবনের নৌকা ভিড়িতে ভিড়িতে ক্রমে একটা আবর্ত্তের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। হঠাৎ সেই আওড়ের মুখে পড়িয়া ব্যাকরণ, কাব্য, বন্ধু, ঐশ্বর্য্য সব কোথায় ভাসিয়া গেল; সেই নৌকা-বানচাল তীব্র ঘূর্ণির উপরে জীবনে প্রথম বারের জন্য নিজের অন্তরস্থিত দানবীয় শক্তির সঙ্গে তাহার মুখোমুখি সাক্ষাৎকার ঘটিল।

"গৌর! আজ হইতে তিন মাস পরে আমার বিবাহ—কি সর্ব্বনাশ! আমার ভাবী পত্নী এক জমিদার-কন্যা—বেচারা! তাহার অদৃষ্টে কত না দুঃখ আছে! তুমি তো জান, বিদেশে যাইবার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে কত প্রবল! সূর্য্য উদিত না হইতেও পারে, কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা আমি মন হইতে দূর করিতে পারি না। নিশ্চিত জানিও, আর দুই এক বৎসরের মধ্যে আমি হয় ইংলণ্ড যাইব, নতুবা জীবিত থাকিব না—এ দুইয়ের একটা নিশ্চয় ঘটিবে।"

আমরা নিশ্চয় জানি, এ দুইয়ের কোনটাই ঘটে নাই। মধুসূদন দুই এক বছরের মধ্যে ইংলণ্ডে যাইতে পারেন নাই, এবং দিব্য বাঁচিয়া ছিলেন।

যে সময়ে বাঙালী বালকেরা ত্রয়োদশে বিবাহিত হইয়া চৌদ্দয় পিতৃত্ব লাভ করিত, সেই সময়ে মধুসূদনের পিতা বিশ বছর পর্য্যন্ত পুত্রকে অবিবাহিত রাখিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার মনের সামাজিক উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবির পিতাদের প্রতি প্রায়ই সুবিচার হয় না; ভবিষ্যতের লোকেরা পুত্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাঁহাদের দোষী সাব্যস্ত করে; কিন্তু কবির সমসাময়িক অন্য লোকেরাও কবিদের ভুল বুঝিয়াছে—এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়: কবির পিতারাও সেই সমসাময়িকদের অন্যতম।

মধুসূদনের পিতামাতা যে একমাত্র পুত্রের বিবাহের চেষ্টা করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই; মধুর মত আর্থিক অবস্থার যুবকদের আগেই বিবাহ হইত। হয়তো রাজনারায়ণ দত্ত এত শীঘ্র বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন না, কিন্তু জাহ্নবী দেবীর তাগিদে তাঁহাকে সচেষ্ট হইতে হইয়াছিল। মধু বিবাহের কথা শুনিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতামাতা সন্তানের বৈবাহিক আপত্তিকে প্রায়ই মৌখিক মনে করেন। বিবাহের পত্র হইয়া গেলে মধুসূদন জাহ্নবী দেবীকে বলিলেন, মা, এ কাজ কেন করলে, আমি তো বিবাহ করব না।

মাতা ভাবী বৈবাহিক ও বধূর প্রশংসা করিলে মধু পুনরায় বলিলেন, মা, তুমি যতই বল, বাঙালীর মেয়ে রূপ গুণে কখনই ইংরেজের মেয়ের শতাংশের একাংশও হতে পারে না।

এই বাক্যই মধুসূদনের কাল হইল; জাহ্নবী দেবী ভীত হইলেন; দুই একটি যুবকের খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের কথা তিনি শুনিয়াছিলেন। তিনি যত শীঘ্র সম্ভব পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

হঠাৎ একদিন রাজনারায়ণ দত্ত গৌরদাসের পিতা রাজকৃষ্ণ বসাকের কাছে আসিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলিলেন, মধুসূদন কোথায় চ'লে গিয়েছে, আমরা তার কোন সন্ধান জানি না। তোমার ছেলে গৌরদাসের সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্ব, সে এ বিষয়ে সন্ধান দিতে পারে। কিন্তু গৌরদাস কিছুই বলিতে পারিল না।

উনিশ আর বিশে বাংলা প্রবাদ অনুসারে প্রভেদ নগণ্য, কিন্তু উনবিংশ ও বিংশ শতকে প্রভেদ এত বেশি যে, আমরা পূর্ব্বগামী শতাব্দী সম্বন্ধে এক রকম কিছুই

জানি না। অনেকেরই ধারণা তৎকালীন হিন্দু কলেজ হিন্দু ছাত্রদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসাহ দিত। কথাটা সত্য নয়। বরঞ্চ হিন্দু কলেজের আবহাওয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের বীজাণুর পক্ষে অনুকূল ছিল না; সত্য কথা বলিতে কি, সে আবহাওয়া সকল ধর্ম্মের বীজাণুর পক্ষেই প্রতিকূল ছিল। এ সম্বন্ধে মধুসূদনের একজন সহাধ্যায়ী লিখিতেছেন—

"কলেজের অধিকাংশ ছাত্র হিন্দুর আচার-ব্যবহারে অনাস্থা প্রকাশ করিতেন সত্য! কিন্তু ঐ কলেজের কোন ছাত্র যে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, এ আশঙ্কা অনেকের ছিল না। তাহার কারণ দুইটি;—প্রথম কারণ, অনেকে গিবন পড়িতেন; ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব-সময়ের আর আর গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ লইয়া বাদানুবাদ করিতেন এবং মৃত ডিরোজিও সাহেবের অনুকরণ করিতেন। দ্বিতীয় কারণ, মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেব। কে কোথায় যাইতেছে, কি করিতেছে ইত্যাদি বিষয়ে তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, এমন কি ছাত্রের পিতামাতা যাহা না জানিতেন, হেয়ার সাহেব তাহা জানিতে পারিতেন। এই স্থলে আমার নিজের এক দৃষ্টান্ত প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"মির্জাপুর মিশনে মেণ্ডিস নামে এক পাদরী আসিয়াছিলেন। কলেজের যে ছাত্র বাইবেল পড়িতে ইচ্ছা করিবে, তাহাকে তিনি এক এক খণ্ড উক্ত পুস্তক উপহার দিবেন, এই ঘোষণা করায় আমরা ছয়সাতজন কলেজের ছাত্র তাহার কাছে উপস্থিত হই। তিনি অতি সমাদরে আমাদের বসাইয়া, আপন ধর্ম্মের গুণকীর্ত্তন করেন। পরে বিদায় হইবার সময় এক এক খণ্ড বাইবেল দেন।

"পথে আসিবার সময় প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, বাইবেল উপহার পাওয়ার কথা কাহাকেও জানাইব না। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ হেয়ার সাহেবের অনুসন্ধান কে বলিতে পারে! তিনি পাঁচ ছয় মাস পরে এক দিবস আমাদের সকলকে চারটার পর তাঁহার নিকট যাইতে কহেন, কিন্তু একই দিনে সকলকে যাইতে বলেন নাই। প্রথমে —কে লইয়া যান; তাহাকে অনেক মিষ্ট কথা কহিয়া জানিয়া লন। এইরূপ সকলকে ডাকিয়া বাইবেলগুলি হস্তগত করেন। দুই তিন দিবস পরে তাঁহার প্রিয় মালী কাশী দ্বারা আমাদের ডাকাইয়া লইয়া যান। এক্ষণে যেখানে ক্যাথিড্রেল মিশন কলেজ, সেই স্থানে উপরের ঘরে তাহার বৈঠক হইত। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি এক বিকট মূর্ত্তি ধারণ করেন। তাঁহার এমন মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই। আমাদের যেমন কর্ম্ম তেমনই প্রায়শ্চিত্ত হইল, অর্থাৎ প্রত্যেককে এক এক ডজন বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া

দিলেন। আসিবার সময় নানা প্রকার মিষ্ট কথা বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেন। আমরা সেই অবধি বাইবেল পড়া দূরে থাকুক, কোন গির্জার নিকট দিয়া চলিতাম না।"

ইহা তো এক দিকের কথা মাত্র, কলেজের ভিতরের দিকের কথা ; কিন্তু আর এক দিক ছিল ; কলেজের বাহিরে প্রকাণ্ড দেশ, যেখানে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব ও প্রলোভন যেমন বেশি, তেমনই আবার হেয়ার সাহেবের বেত্রদণ্ড সেখানে অচল।

মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জ্জি লিখিতেছেন—

"আমি তখন হেদুয়ার নিকটে বাস করি ; তখন আমি ক্রাইস্ট চার্চ্চের পাদ্রী। সে একদিন ধর্ম্মজিজ্ঞাসু-রূপে আমার নিকট আসিয়া আত্মপরিচয় দিল, শীঘ্রই খ্রীষ্টান হইবে বলিল। দুই তিন দিন যাতায়াতের পর ও অনেক আলাপ করিয়া বুঝিলাম, তাহার খ্রীষ্টধর্ম্মে ভক্তি ইংলণ্ডে যাইবার ইচ্ছা অপেক্ষা বেশি নয়। আমি তাহাকে স্পষ্ট বলিলাম, বিলাত যাইতে সাহায্য করিতে আমি অসমর্থ। সে যেন অসন্তুষ্ট হইল। ইহার পর সে আর ঘন ঘন আসিত না।"

রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানিলে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার চেয়ে বেশি জানি। তিনি খ্রীষ্টান হইলে বিলাত পাঠাইতে অসমর্থ, কিন্তু খ্রীষ্টান না হইলে পুলিসে দিবার ভয় দেখাইতে ছাড়েন না। যথা—

"তৎপর আমি একখানি রঘুবংশের জন্য প্রখ্যাতনামা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গমন করি। ঐ সময় খুব সম্ভব হুইলার সাহেব তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন, 'কেন তুমি ভিক্ষা কর ? খ্রীষ্টান হও, সকল সাহায্য পাইবে, অন্যথা তোমাকে পুলিসে দিব'।"

এই বিবৃতির পরে মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দায়িত্ব কতখানি, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে খুব সম্ভব তিনি যে সাফাই গাহিয়াছেন, তত সামান্য নয়। খ্রীষ্টধর্ম্মে সত্যই কেহ অনুরক্ত হইলে, তিনি তাহাকে দীক্ষিত করিয়া লইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুরাগ বিলাত যাইবার নামান্তর মাত্র, পাদ্রী সাহেব নিজেই তাহা বলিয়াছেন, এ সম্বন্ধে মধুর খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণে তাঁহার আনন্দিত হইবার কথা নয়। কিন্তু ধর্ম্ম যেখানে অপর কিছুর ছদ্মবেশ, সেখানে এত সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে চলে কেমন করিয়া !

যাহা হউক, ক্রমে দুই তিন দিনের মধ্যে প্রকাশ পাইল, মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের জন্য পাদ্রীদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং পাছে পৌত্তলিক লাঠিবাজ হিন্দুরা মধুকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যায়, এই ভয়ে পাদ্রীরা তাঁহাকে কেল্লায় সৈন্যদের হেফাজতে নিরাপদ

করিয়া রাখিয়াছে। সকলে যখন মধুর জন্য চিন্তা করিতেছে, কি ভাবে তাঁহাকে পাদ্রীদের কবল হইতে উদ্ধার করা যায় তাহাই ভাবিতেছে, এমন সময় রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পিতার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন—

"আপনারা অনর্থক মধুর জন্য চেষ্টা করিতেছেন। খ্রীষ্টান হইবার জন্য তাহার দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছে। সে খোকা নয়, দুগ্ধপোষ্য বালক নয় যে, পাদ্রীরা তাহাকে ভুলাইয়া খ্রীষ্টান করিবে। ধর্ম্মের দোষগুণ নির্ব্বাচন করিতে তাহার উপযুক্ত বুদ্ধি ও বয়স হইয়াছে এবং হিন্দুধর্ম্মের অসারতা জানিয়া মধু খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। এই দেখুন তাহার কেমন বুদ্ধি; আপনাদের তাহার প্রতি বল প্রয়োগ করিবার আশঙ্কায় সে লাট-পাদ্রীর নিকটে প্রার্থনা করিয়া তাঁহার অনুরোধমতে কেল্লার মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে এবং কেল্লার কর্ত্তা ব্রিগেডিয়ার পৌনি সাহেব সাদরে মধুকে আপন কুঠিতে স্থান দিয়াছেন যেন আপনারা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে না পারেন।"

এ উক্তি কাহার? কৃষ্ণমোহনের না কোন পেক্‌স্নিফের? "ধর্ম্মের দোষগুণ নির্ব্বাচন করিয়া" এবং "হিন্দু ধর্ম্মের অসারতা জানিয়া"! বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কি তাঁহার বিলাত-গমনের উৎকট আকাঙ্ক্ষার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন?

গৌরদাস মধুসূদনের সহিত কেল্লায় দেখা করিতে গেলেন। সৈনিক ও পাদ্রীবেষ্টিত মধুসূদন কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক বন্ধুর সমীপে আসিলেন। একা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না, কি জানি আবার তাঁহার সুপ্ত পৌত্তলিক প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠে! শুধু পাদ্রীদের উপরেও বিশ্বাস নাই; বাইবেল প্রভাবশালী বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে বারুদ যুক্ত হইলে একেবারে অব্যর্থ। বাইবেল ও বারুদ ইউরোপীয় সভ্যতার যমজ সন্তান, খ্রীষ্টধর্ম্মের উপযুক্ত প্রতীক;—একটি ভগবানের, অপরটি সয়তানের।

মধু নব-ধর্ম্মের বিষয়ে অনেক আলোচনা করিলেন। কুসংস্কারের ক্রোড় হইতে কেমন করিয়া হঠাৎ তাঁহার কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তাহাও বলিলেন, কেমন ভাবে বিলাত যাইবার ছদ্ম ইচ্ছার জানালা দিয়া নূতন আলোক তাঁহার মনে প্রবেশ করিয়াছে, বলিলেন। কিন্তু মূঢ় গৌরদাস আলোকের চিহ্নমাত্র মধুসূদনের কোনখানে দেখিতে পাইলেন না, না তাঁহার মুখে, না তাঁহার ভবিষ্যতে। পিতামাতার শোকের কথা বর্ণনা করিয়া একবার তাঁহাকে বাড়ি গিয়া দেখা দিয়া আসিতে বলিলেন। হঠাৎ মধু এক সেলাম ঠুকিয়া প্রস্থান করিলেন। ইহাই মধুর ধর্ম্ম!

* * *

তারপর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি মধুসূদনের দীক্ষা হইল। পাছে দীক্ষার সময় হিন্দুরা গির্জা আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় সৈন্যদল পাহারায় নিযুক্ত হইল। রুদ্ধদ্বার

দরজায় "খ্রীষ্টতাপাদন" চলিতে লাগিল। খ্রীষ্টদেব যে ধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার বাহিরের দরজা বন্ধ করিলে কি আসে যায়, ইহাই বোধ হয় পাদ্রীদের মনের কথা!

দীক্ষাস্থলে আর্চ-ডীকন ডিলট্রি উপস্থিত—শুষ্ক নাসা ও অস্থিবহুল মুখমণ্ডল লইয়া; কড়ি-কাঠে নিবদ্ধদৃষ্টি রেভারেণ্ড বাঁড়ুজ্জে মহাশয় উপস্থিত; আর দুইচারজন সহৃদয় ইংরেজ সপরিবারে উপস্থিত; মধুসূদন সগর্ব্বে দণ্ডায়মান, সকলের মনোযোগের কেন্দ্রে ও নূতন পোশাকের পারিপাট্যে।

মধুসূদনের স্বলিখিত সঙ্গীত আরম্ভ হইল—

Long Sunk in superstition's night,
By Sin and Satan driven—

... ...

I hasten'd to Eternity
O'er Error's dreadful sea!

মধু উপস্থিত ব্যক্তিদের উপর তাঁহার গানের প্রভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন; আন্তরিকতা অপেক্ষা অন্ত্যানুপ্রাসের প্রতি তাঁহার অধিক দৃষ্টি। এ দীক্ষা-সঙ্গীতের অর্থ সম্বন্ধে আর যাহার মনেই দ্বিধা থাকুক, বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের ছিল না। তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন—"**I hastene'd to Eternity. O'er Error's dreadful sea**"-টা নিরেট রূপক; **Eternity** অর্থ ইংলণ্ড, আর **dreadful sea**-টা আধিভৌতিক সমুদ্র; তবে সেটা বঙ্গোপসাগর, না, ঝঞ্ঝাসঙ্কুল বিস্কে উপসাগর? আর এই সঙ্গীতের তালে তালে দূর ভবিতব্যের অশ্রুত কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল—

"আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে।"

মাইকেলের খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণ সম্বন্ধে নানা মত আছে। তিনি যে পরবর্ত্তী কালে খ্রীষ্টধর্ম্মে অবিশ্বাস করিতেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে এ কথা ঠিক, দীক্ষার সময় খ্রীষ্টধর্ম্মে না ছিলেন তিনি অনুরক্ত, না জানিতেন সে বিষয়ে বিশেষ কিছু। তিনি কি অবাঞ্ছনীয় বিবাহ-সম্বন্ধ হইতে নিষ্কৃত-লাভের জন্য এ কাজ করিয়াছিলেন? তিনি কি বহু-বাঞ্ছিত ইংলণ্ড-গমনের জন্য এই চাল দিয়াছিলেন? দুইটাই সম্ভব, কিন্তু আরও একটা কারণ থাকা অসম্ভব নয়। জাহাজ দেখিলে যাঁহার ইংলণ্ডের কথা মনে পড়ে, সমুদ্র যাঁহার কানে ইংলণ্ডের বাণী আনিয়া দেয়, বাস্তব অপেক্ষা কল্পনা যাঁহার কাছে বড়, তমলুক গিয়া যিনি মনে করেন ইংলণ্ডের কাছে আসিয়াছেন, মাদ্রাজ-পলায়নের মধ্যে

যাহার ইংলণ্ডের পথে এক ধাপ অগ্রসর হইয়া থাকিবার উদ্দেশ্য, তিনি দান্তে টাসো বায়রন বিশেষ মিল্টনের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সহিত খানিকটা একাত্মতা অনুভব করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের অনেকগুলি কারণের মধ্যে ইহা একতম নয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারে না।

মাইকেলের মহাকাব্য রচনার আকাঙ্ক্ষা এ দেশে থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মহাকাব্য লিখিতে তাঁহাকে ইংলণ্ডে যাইতে হয় নাই। যে ইংলণ্ডের জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা, তাহা আটলান্টিকের পারে নয়, মানস-সরোবরের তীরে। সেই **"Land of heart's desire"** হৃদয়েই। মিল্টনের স্পর্শ তিনি এ দেশে বসিয়াই পাইয়াছিলেন। তাঁহার যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ রচনা, তাহা বিলাত-গমনের পূর্ব্বে; কেবল সনেটগুলি বিলাত-গমনের পরে লিখিত। কাব্য-রচনা শেষ হইয়া গেলে, যে ইংলণ্ডে তিনি যাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেন এবং অবশেষে যে দেশে গিয়াছিলেন, তাহা আর কাব্যের প্রতীক ছিল না, ঐশ্বর্য্যের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই কাব্য ও ঐশ্বর্য্যের দ্বিত্ব তাঁহার কাব্য ও জীবনের প্রায় সর্ব্বত্র। এই দ্বৈত সত্তার ধুয়া তাঁহার জীবনসঙ্গীতে ধ্বনিত হইতেছিল—মহাকাব্য কতদূর! ইংলণ্ড কতদূর!

বিশপ্‌স কলেজের নিকট গঙ্গার তীরে একটি যুবক। যুবকের পরিধানে নূতনতম ফ্যাশানের সাহেবী পোশাক। যুবক নিঃসঙ্গ, নীরব। একখানি জাহাজ সমুদ্রের দিকে যাইতেছে—যুবকের লক্ষ্য সেই দিকে। তিনি ভাবিতেছেন, এ জাহাজ যায় কোথায়? বোধ করি সেই ইংলণ্ডে। ডেকের উপরে সাহেব মেম পদচারণা করিতেছে; যুবক ভাবিতেছেন, তাহারা কত সুখী! তিনি জাহাজের নাম পড়িতে চেষ্টা করিলেন, আসন্ন অন্ধকারে পড়া গেল না। যুবক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ভাবিলেন, আঃ! আমি যদি ইংলণ্ডে যাইতে পারিতাম!

যুবকের নাম মাইকেল এম, এস্, ডাট এস্কোয়ার, বিশপ্‌স কলেজের ছাত্র।

মধুসূদন দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। জাহাজ গঙ্গার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। নদীর পরপার অস্পষ্ট হইয়া আসিল। তিনি খ্রীষ্টান হইয়া বিলাতের পথে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন? জর্ডন ও টেম্‌স যেখানে ছিল সেখানেই আছে, তিনি কেবল গঙ্গা পার হইয়াছেন। বিলাত নিকটে আসিল না, ভারতবর্ষ বহুদূরে গিয়া পড়িল; ইংরেজ নিকটে আসিল কই? হিন্দুরাই বহুদূরে গেল; আত্মীয়স্বজন পর হইল, পাদ্রীরা আপন হইল না মাঝে মাঝে রেভারেণ্ড বাঁড়ুজ্জে মহাশয় আসেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি বাইবেল ও

কড়িকাঠের মধ্যে নিঃশেষে বিভক্ত, অন্য দিকে মন দিবার অবকাশ তাঁহার থাকে না। কাজেই মধুসূদন এখন হিন্দু পিতার অর্থে বিশপ্‌স কলেজের ছাত্র হইয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ও ঋণের চর্চ্চা করিতেছেন।

মধুসূদন নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। মনটা ভাল ছিল না, কলেজে একটা গণ্ডগোল চলিতেছিল। দেশীয় খ্রীষ্টানদের পরিধেয় পোশাক অকৃত্রিম খ্রীষ্টানদের পোশাক হইতে ভিন্ন। তিনি এই কুসংস্কারের প্রতিবাদকল্পে, রামধনুর রঙকে পরাজিত করে এমন একটা বিচিত্র পোশাক পরিধান করিয়াছিলেন—তাহাতে গোলমাল আরও জটিল হইয়া উঠিল।

তিনি ঘরের জানালা খুলিয়া বাহিরের দিকে তাকাইলেন; সানাইয়ের সুরে পূরবীর রেশ। খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের বাঁশী? সে দেশীয় খ্রীষ্টান দেখিয়া অত্যন্ত উপেক্ষার স্বরে বলিল, কিছু না সাহেব, হিন্দু লোকদের দুর্গাপূজার বিসর্জ্জনের বাজনা। তাঁহার অকৃত্রিম বিদেশী পোশাক-পরা কৃত্রিম হিন্দুহৃদয়ের মধ্যে ছাঁত করিয়া উঠিল। তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই বাঁশীর করুণ আলাপ শুনিলেন। এক কানে সানাইয়ের সুর, অন্য কানে ব্যঙ্গকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল—

I've broke Affection's tenderest ties
For my blest Saviour's sake!

মধুসূদনের ইচ্ছা সেই সুর আর একটু শোনেন, কিন্তু মাইকেল সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া এক টানে বাইবেল খুলিয়া বসিলেন; বাইবেলের পাতার ফাঁক হইতে কোলের উপর খুলিয়া পড়িয়া গেল—একখানা মোটা অঙ্কের বিল—অপরিশোধিত।

সেদিন আহারের সময় আর এক গোলযোগ ঘটিল। মধুসূদন মদ্য চাহিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে দিতেই মদ ফুরাইয়া গিয়াছে।

মধু হাঁকিল, মদ চাই-ই; ভাণ্ডারী বলিল, মদ নাই-ই। তখন তিনি ক্রোধে গেলাস প্লেট আছড়াইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কয়েকবার পদচারণা করিয়া বইয়ের আলমারির নিকট আসিলেন। বায়রনের গ্রন্থাবলী টানিয়া লইতে গিয়া দেখেন সে স্থান শূন্য। বইখানা কয়েকদিন হইল অন্যত্র গিয়াছে, পুরাতন পুস্তকের দোকানে। বিরক্ত হইয়া জানালা খুলিয়া দিলেন, কানে আসিল সেই শব্দ—দশমীর চাঁদের আলোয় বিসর্জ্জনের বাদ্য। চাঁদের আলো তির্য্যক্ ভাবে আসিয়া পড়িল টেবিলের উপরে, শূন্য বোতলের উপর কৌতূহলী ইঙ্গিত—শূন্য মদের বোতল। মধুসূদন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় পদচারণা করিতে লাগিলেন। বিসর্জ্জনের বাদ্য ও শূন্য মদের বোতল!

মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার উক্ত কার্য্যে উৎসাহদাতা বন্ধুগণ একে একে অন্তর্হিত হইলেন এবং তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পৌত্তলিক পিতার অর্থে বিশপ্‌স কলেজে ভর্ত্তি হইতে হইল। রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রের উপর বিরূপ হইলেও, তাঁহার ইতিমধ্যেই যথেষ্ট তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ আর না অন্ধকার হয়, সেইজন্য পুত্রের শিক্ষার ভার বহন করিতে লাগিলেন। পিতার নিয়মিত এক শত টাকা ছাড়া জাহ্নবী দেবী লুকাইয়া মাঝে মাঝে মধুসূদনকে টাকা দিতেন। এই পৈতৃক অর্থপ্রাপ্তি সম্বন্ধে মধুসূদনের কোন চিঠিপত্র পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলে, আমাদের বিশ্বাস, তন্মধ্যে হাস্যরসের অনেক উপাদান মিলিত।

মধুসূদন বিশপ্‌স কলেজে ১৮৪৩ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিলেন। এই সময় তাঁহার আর্থিক বা পারমার্থিক কোন উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি না, বরং বিপরীত তথ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু মধুসূদনের ভাবী কবি-জীবনের উপরে এই কয়েক বছরের শিক্ষার প্রভাব উল্লেখযোগ্য। মধু পণ্ডিত ও কবি; একাধারে তিনি পণ্ডিতকবি; সারা জীবন ধরিয়া তিনি পাণ্ডিত্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত বহুভাষাবিদ্‌ লোক সেকালে খুব কম ছিল। যে প্রশস্ত পাণ্ডিত্যের উপরে তাঁহার ক্লাসিক্যাল প্রতিভার প্রতিষ্ঠা, বিশপ্‌স কলেজে সেই ভিত্তিপত্তনের সূত্রপাত। তিনি এই সময়ে গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন; ফরাসী আগেই শিখিয়াছিলেন; আর একটি জিনিস তিনি শিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, না শিখিয়া উপায় ছিল না, পরবর্ত্তী জীবনে তিনি "জ্ঞানোন্নতি-বিধায়িনী সভা"র সভ্যদের মুখে যে অদ্ভুত বাংলা বুলি দিয়াছিলেন, সেই বাংলা এই সময়ে শেখা।

"একদিন কলেজের গির্জায় এক পাদ্রী সাহেব বাংলা ভাষায় আমাদের জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন, আমরা অদ্য তাম্বু ফেলিলাম, কল্য উঠাইয়া লইলাম এবং অন্য স্থানে তাম্বু গাড়িলাম!" এই বিলাতী বাংলা শুনিয়া মাইকেল উপাসনালয়ে হাসিয়াছিলেন। বিশপ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে পরে হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মধুসূদন বলিলেন, ওরূপ বিলাতী বাংলা শুনিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না।

(মধুসূদন নিজে "বাংলা ভুলিয়া গিয়াছি" বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, "পৃথিবী"কে "প্রথিবী" লিখিতে পারেন; কিন্তু ঐরূপ অদ্ভুত বাংলা শুনিলে তাঁহার মধ্যেকার শিল্পী আত্মসংবরণ করিতে পারে না—হাসিয়া ওঠে।)

বাহির হইতে যেমনই দেখা যাক, মধুসূদন মনে মনে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ অনুভব করিতেছিলেন। এই মানসিক নিঃসঙ্গতার অনুভূতি প্রতিভাবান্‌ পুরুষদের একটি লক্ষণ।

খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের পর হইতেই এই একাকিত্ব তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল, বিশপ্‌স কলেজেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। একখানি পত্রে তিনি গৌরদাসকে লিখিতেছেন—

"আমি একাকী! লোকের সাহচর্য্য আমার আবশ্যক। তুমি কি আজিকার দিনটা আমার সঙ্গে কাটাইতে পারিবে? আমি নিশ্চিত জানি তুমি পারিবে না, কিন্তু তুমি আমার বন্ধু বলিয়াই কর্ত্তব্যের খাতিরে তোমাকে জানাইয়া রাখিতেছি যে, আমার কাহারও সাহচর্য্য একান্ত আবশ্যক।"

মধুসূদনের জীবনে যে কয়টি দুর্জ্ঞেয় রহস্য আছে, বিশপ্‌স কলেজ হইতে মাদ্রাজ-গমন তন্মধ্যে একটি। এই আকস্মিক কার্য্যের কারণ কি? তাঁহার জীবনীকারেরা পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য বলিয়া এই ঘটনাকে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন! কিন্তু কি এমন মনোমালিন্য যাহাতে পিতা খরচ দেওয়া বন্ধ করিলেন? খ্রীষ্টান হইবার পরেও তো খরচ দিতে অসম্মত হন নাই! মধুর চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যই কি রাজনারায়ণ দত্ত শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে এই কাজ করিয়াছিলেন? মাদ্রাজ যাইবার এমন কি জরুরী প্রয়োজন ছিল, যাহাতে সরকারী চাকুরীর জন্যও তিনি কয়েক মাস অপেক্ষা করিতে পারিলেন না? আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেহ তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিল না; এমন কি গৌরদাসও নয়—যে গৌরদাসের কাছে কোন কথা তিনি গোপন করিতেন না। মাদ্রাজে যাইবার তাঁহার উদ্দেশ্য কি? আর্টিস্ট মধুসূদন কি মনে মনে বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, তিনি অদ্ভুত খাপছাড়া হইয়া উঠিতেছেন, নূতন জীবনের মধ্যেও তিনি স্থান পান নাই, পুরাতন পরিবেশের মধ্যেও তিনি অসংগত? এই প্রক্ষিপ্ত জীবনকে চুকাইয়া দিবার জন্যই কি দেশত্যাগ? না, মাদ্রাজ গিয়া বিলাতের পথে এক পা অগ্রসর হইয়া থাকিবার তাঁহার ইচ্ছা?

কলেজের দশজনের মধ্যে একাদশ জন হইয়া উঠিবার শক্তি মধুর ছিল। চরিত্র-মাহাত্ম্য অপেক্ষা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কলেজের ছাত্রদিগকে বেশি আকর্ষণ করে; আধুনিক কলেজগুলি বুদ্ধিকে প্রখর করিয়া তুলিবার শান-পাথর; চরিত্রবান্ ছাত্ররা সেই অনুপাতে বুদ্ধিমান্ না হইলে স্কুলকলেজে একেবারে নিষ্প্রভ। কলেজের চর্চ্চা বুদ্ধির, পরীক্ষা বুদ্ধির; এই কলেজীয় মাপকাঠিতে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে গিয়া বাঙালী এক শতাব্দী মধ্যে ধীসর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু ইন্টেলেক্ট শেষ পর্য্যন্ত চারিত্রিক পীঠভূমি ছাড়া দাঁড়াইতে পারে না; বাঙালী এক শতাব্দীর কলেজীয় শিক্ষার অবসানে আসিয়া আজ যে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ বাঙালীর ইন্টেলেক্ট ও চরিত্র সমানভাবে

গড়িয়া উঠে নাই। ইণ্টেলেক্ট-মাত্র-সহায় খঞ্জ বাঙালী ভারতীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, যেমন করে ভিড়ের মধ্যে আর দশজনের চেয়ে খোঁড়া লোকটা।

মধুসূদনের কলেজের খ্যাতির মূলে এই ব্যালান্সের অভাব; সকলেই জানিত—মধু বুদ্ধিমান্, আবার সকলে সন্দেহ করিত—মধু সে পরিমাণ চরিত্রবান্ নন; এই সময় হইতেই ছাত্রদের নিকটে, বন্ধুদের নিকটে মধুসূদন রহস্যময় ছিলেন; তাই সকলের ছিল মধুর প্রতি এমন আকর্ষণ।

মধু ধনীর সন্তান ছিলেন। কাজেই ব্যাবহারিক দিক দিয়া বিদ্যার বেশি প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। কলেজকে তিনি একান্তভাবে অর্থাৰ্জ্জনের ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন নাই। সত্য কথা বলিতে কি, হিন্দু কলেজের প্রথম আমলের অনেক ছাত্রই সেরূপ মনে করিত না। সে আমলের ছাত্ররা জ্ঞান অর্জ্জন করিতে গিয়া টাকার স্বাদ পাইয়াছিল —আর এ আমলের ছাত্ররা!

মধুসূদন কলেজে পড়া আরম্ভ করিবার পর হইতেই বিখ্যাত—কলেজের মধ্যে; এই কলেজীয় খ্যাতি মধুর পরবর্ত্তী জীবনে কাজে লাগিয়াছিল; কারণ এখানে যে সমস্ত ছাত্রদের সঙ্গে তাহার আলাপ হইয়াছিল, তাহাদের অনেকেই ভবিষ্যতে বাংলা দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, মধুকে পরবর্ত্তী দুঃসময়ে তাহারা সাহায্য করিয়াছিলেন। মধুর জীবনে বন্ধুপ্রীতি একাধিক অর্থে সার্থক; আত্মীয়রা তাঁহাকে বাধা দিয়াছেন, বন্ধুরা তাহাকে সাহায্য করিয়াছেন—প্রীতি এবং ঋণ দিয়া।

মধুর সহপাঠী-সমপাঠীরা প্রায় সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, তাঁহার মত এমন বুদ্ধিমান্, সাহিত্য-রসিক, ইংরেজী-ভাষাভিজ্ঞ, মেধাবী ছাত্র কচিৎ দৃষ্ট হয়। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক রিচার্ডসন মধুর আদর্শ ছিলেন; সাধারণ ছাত্ররা রিচার্ডসনকে বুঝিতে পারিত না, তাহারা মধুকে আদর্শ করিয়া লইয়াছিল।

ডিরোজিও এবং রিচার্ডসন সে আমলের বাঙালী ছাত্রদিগকে দুই দিক দিয়া অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন; ডিরোজিও ধীপ্রবণ, রিচার্ডসন ভাবপ্রবণ; ডিরোজিও বাঙালীর বিচারবুদ্ধিকে, রিচার্ডসন বাঙালীর রস-পিপাসাকে জাগ্রত করিয়াছিলেন; আবার দুইজনেরই নৈতিক চরিত্রের অভাব ছিল। এই ব্যালান্স-হীনতাই দুইজনকে বাঙালী ছাত্র-সমাজের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। হেয়ারকে তাহারা ভক্তি করিত; কিন্তু ভালবাসিত এই দুই চারিত্র-মাহাত্ম্যহীন অধ্যাপককে। (ভালবাসিবার পক্ষে একটুখানি খুঁত প্রয়োজন।) ডিরোজিওর ছাত্রদের অনেকেই পরবর্ত্তী কালে সংস্কারক হইয়াছেন; রিচার্ডসনের ছাত্রদের অনেকে সাহিত্যিক; মধু এই শেষোক্ত দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

মধুর কলেজীয় খ্যাতির প্রধান কারণ—মধু কবিতা লিখিতেন, ছাত্ররা ডিরোজিও

রিচার্ডসনকে কবিতা লিখিতে দেখিয়াছে; মধুও কবিতা লেখেন ইংরেজী ভাষায়, তাহারা অবাক্ হইয়া যাইত; মধুকে রিচার্ডসন-ডিরোজিও-র ক্ষুদ্র সংস্করণ মনে করিত। বলা বাহুল্য, কেহই মধুর কবিতা বুঝিত না। অবাক্ বনিবার পক্ষে না বোঝাই ভাল—বুঝিলে মধুর এই সব কাব্য-আবর্জ্জনা কেহ সযত্নে রক্ষা করিত না।

তাহারা মধুর কাব্য বুঝিত না বলিয়াই, কেহ তাঁহাকে স্কট, কেহ মুর, কেহ বায়রন বলিত। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের কথা বলিতেছি, বাঙালী ছাত্রমহলে ইউরোপের আসনচ্যুত এই সব কবিরাই বোধ হয় তখন কাব্যের অধিদেবতা ছিলেন। সে আমলের ছাত্রদের তুলনায় আজকালকার ছাত্রদের আর যে দোষই থাক্, কাব্য-বিষয়ে আধুনিকরা অধিকতর সজাগ—বোধ হয় কিছু বেশিই সজাগ।

রিচার্ডসন মধুকে বোধ হয় তাঁহার বন্ধুগণের অপেক্ষা বেশি বুঝিয়াছিলেন, তিনি মধুকে পোপ বলিতেন; বলা বাহুল্য, মধু খুশি হইতেন। অবশ্য পোপের প্রতিভা মধুর আছে রিচার্ডসন এ কথা মনে করিতেন না; তিনি বুঝিয়াছিলেন, মধুর ইংরেজী কবিতা পোপের কাব্যের নকল। সেকালের ছাত্ররা যে স্কট-বায়রনের কাব্যের অনুকরণ করিত, সে স্কট-বায়রন পোপের শিষ্য, তাহারা অষ্টাদশ শতকের ধরণের কবি। যে স্কট-বায়রন রোমান্টিক কবি, তাঁহাদের বুঝিবার ও অনুকরণ করিবার শক্তি তখনকার ছাত্রদের ছিল না, অনেককাল পরের ছাত্ররা তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, মধু স্কট-বায়রনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা পোপের অনুপ্রেরণা; স্কট ও বায়রন উভয়েই পোপকে কাব্যাদর্শ মনে করিতেন।

প্রকৃতপক্ষে মধুর কাব্য-জীবনে রোমান্টিক কবিদের কোন প্রভাব নাই; রোমান্টিক কবিতা উপলব্ধি করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না; তাঁহার কাব্য-জীবনের আরম্ভে পোপ ও পরিণামে মিল্টন; পোপের **Prettiness** হইতে মিল্টনের **Sublimity**-তে, পোপের **Pseudo-classicism** হইতে মিল্টনের **classicism**-এ উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস মধুর কাব্যে।

মধুসূদনের ইংরেজী কাব্যের তেমন আলোচনা হয় নাই—বাংলা কাব্যের আওতায় তাঁহার ইংরেজী কাব্য ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ইংরেজী কবিতার আলোচনা করিলে মধুসূদন দত্ত ব্যক্তির কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে, কারণ অধিকাংশ কবিতা লিরিক, ইহাতে কবির ব্যক্তিত্বের আভাস আছে। তাঁহার পরবর্ত্তী অধিকাংশ বাংলা কাব্য কমবেশি নৈর্ব্যক্তিক; ইহাতে কবি আপন প্রতিভার অন্তরালে অন্তর্হিত; মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা

ও নাট্যসমূহ অনেক পরিমাণে Privacy of glorious light-এর মত কাজ করিয়াছে; কেবল শেষ-জীবনের সনেটগুলিতে কবি আবার ধরা দিয়াছেন।

এই সময়কার কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে—

এই সব কবিতায় কবি-জীবনের এমন পূর্ব্বাভাস আছে, যাহাতে মনে হয়, কবির জীবন সুখের হইবে না। তাহার জীবন যে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায়, দুর্য্যোগের বিভীষিকা-পূর্ণ রাত্রির মত, কবি যেন কোন অপূর্ব্ব মন্ত্রবলে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন!

মধুসূদনকে আমরা পূর্ব্বে এক স্থলে 'স্নব' বলিয়াছি, এই 'স্নবারি'র বহু লক্ষণ কবিতাগুলিতে আছে।

মধুসূদনের জীবনের ব্রত যে কাব্য-রচনা, তিনি যে মহাকবি হইবেন, এমন পরিচয়ও আছে।

জীবনে তাঁহার শান্তি নাই; শান্তি ও প্রতিভার স্ফূর্ত্তি যদি কোথাও থাকে তবে তাহা বিলাতে, ইহারও স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

কবি-জীবনের এই অংশটা আলোচনা করিতে করিতে তাহার ঝঞ্ঝা নামে কবিতার একটি ছত্র বার বার মনে পড়ে—"Proclaim the Storm is nigh."

এই ঝঞ্ঝা তাঁহার বিশ বছর বয়সে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল—কবির ধর্ম্মান্তর-গ্রহণে। বলা বাহুল্য, ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের নৈতিক যুক্তি আমি তুলিতেছি না, কারণ মধুর বিশ বছর বয়সে খ্রীষ্টধর্ম্মে এবং হিন্দুধর্ম্মে সমান আস্থা ছিল। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিলেও, হিন্দু থাকিয়াও, যথেষ্ট সামাজিক বিপ্লব তিনি করিতে পারিতেন।

যে ঝঞ্ঝা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই প্রাথমিক প্রলয়-নিশ্বাসে মধুসূদন ধর্ম্মের নঙ্গর ছিঁড়িয়াছিলেন, তেমনই আবার একদিন ইংরেজী সাহিত্যের নঙ্গর ছিঁড়িয়া কবি অতর্কিতভাবে বাংলা সাহিত্যের কূলে ভিড়িলেন।

মাইকেলের জীবনে বারংবার নঙ্গর ছিঁড়িবার ইতিহাস।

Song of Ulysses নামে কবিতায় কবি নিজেকে Ulysses ভাবিয়া বলিতেছেন—

> O Penelope! O Penelope!
> My chaste, my faithful!
> Lo! I shall love, nor love thee less,
> Tho' life decay and fade!

এই Penelope কে, জানেন? কবির কাব্যলক্ষ্মী। কিন্তু Penelope কেন? মধুর কবির আদর্শ হোমার, কাজেই হোমারের সৃষ্ট Penelope তাঁহাকে যে অনুপ্রাণিত

করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! মধুসূদন নিজে ইউলিসিসের মত সমুদ্রে ভ্রাম্যমাণ; সে সমুদ্র জীবন-সমুদ্র; সে সমুদ্র গ্রীক-রোমান ক্ল্যাসিকাল কাব্যের অকূল রহস্যময় সমুদ্র। মধুর কাব্য-জীবন এই দুস্তর সমুদ্রের তরঙ্গ-তাড়িত। তাহার এক পারে ভারতবর্ষ—কবিগুরু বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস; আর অপরপারে হোমার, ভার্জিল, মিল্টন; মধুর কাব্য-জীবন এই দুই পারের মধ্যে নিরন্তর পারাপারে নিরত।

আবার, কতকগুলি কবিতায় বিলাতের আকর্ষণ। মধুর কাছে চিরদিন বিলাত ও কাব্যাদর্শ অভিন্ন।

কি যুক্তিবলে জানি না, বিলাত-গমন ও মহাকাব্য-রচনা তাহার কাছে এক হইয়া গিয়াছিল; তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কোনও রকমে বিলাত গেলেই তিনি মহাকবি হইতে পারিবেন।

মাইকেল কবি, কাজেই এই ভাবটিকে গদ্যে প্রকাশ করিয়া শান্তি কোথায়? পদ্যেও বলিতে হইয়াছে, নাম Extemporary song; মোটেই Extemporary নয়, বহুচিন্তা-প্রসূত।

I sigh for Albion's distant shore,
Its valleys green, its mountains high;

এ কোন্ ইংলণ্ড? যে ইংলণ্ডে তিনি কার্য্যত ব্যারিস্টারি পড়িতে গিয়াছিলেন, সেই দেশ কি? না, এ ইংলণ্ড আদর্শ-ইংলণ্ড, যাহার পরিচয় পাই আমরা ইংরেজী কাব্যে। কিন্তু সেই আদর্শ-ইংলণ্ডের পরিচয়ের জন্য কি সে দেশে যাওয়া আবশ্যক? সে দেশের পরিচয় এ দেশে থাকিয়াই হইতে পারে; মধুরও হইয়াছিল; মহাকাব্য লিখিবার জন্য তাঁহাকে ইংলণ্ডে যাইতে হয় নাই। মধু আদর্শ ও বাস্তবে প্রভেদ করিতে জানিতেন না, শিশুরাও জানে না; মধু, বয়সের কথা ছাড়িয়া দিলে, শিশু ছিলেন। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে সেইরূপ ধারণা মনে বদ্ধমূল হয়।

মাইকেলের মধ্যে একটা দানবীয় শক্তি মুক্তির জন্য ছটফট করিতেছিল; সেই দানবটাই তাঁহাকে সমাজছাড়া করিয়াছিল; বারংবার দেশছাড়া করিয়া ইংলণ্ডে লইবার চেষ্টা করিতেছিল। মাদ্রাজ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছিল; আবার সবেগে বাংলা কাব্যের

ক্ষেত্রে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়াছিল ; বাংলা কবিতার পয়ার-রূপ পায়ের বেড়ি এক আঘাতে শতখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিল এবং অবশেষে সত্য সত্যই ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছিল।

এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়, মাইকেল ইংরেজী কাব্যের যে 'ফর্ম' গ্রহণ করিয়া কবিতা লিখিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার মন তৃপ্তি পাইতেছিল না—কোথাও একটা অশান্তি ছিল, নতুবা মাইকেলের মত একগুঁয়ে লোক যে বেথুন সাহেবের উপদেশ শুনিয়াই ভাল ছেলের মত বাংলা কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা মনে হয় না। মাইকেল কাহারও উপদেশ শুনিবার পাত্র ছিলেন না।

আর কতকগুলি কবিতা আছে, যাহাতে মাইকেলের 'স্নবারি' প্রকাশিত। তাঁহার ভক্তেরা এইগুলিই যেন বেশি পছন্দ করিতেন।

ভোলানাথ চন্দ্র মাইকেল-রচিত **"Night holds her Parliament"** শব্দ-সমষ্টি শুনিয়া পাগল হইয়াছিলেন, তিনি বলিতেছেন, পঞ্চাশ বছর পরেও তিনি কথাটি ভুলিতে পারেন নাই, কাহারও কাহারও দুষ্ট কথা মনে রাখিবার অসীম শক্তি থাকে।

গৌরদাসকে মাইকেল একশিশি পমেটম পাঠাইতেছেন—ল্যাভেণ্ডার পাঠাইতে না পারিয়া তিনি বড়ই দুঃখিত। এই পত্রখানিতে তিন বার **'d-d'** আছে, **'curse'** আছে কয়েক বার ; ভাঙা কলমের প্রতি অভিশাপ আছে ; কলেজের অধ্যক্ষ **K-r** সাহেবের প্রতি ধিক্কার আছে ; তাঁহার দোষ, বোধ করি, তিনি মধুর প্রতিভা স্বীকার করেন নাই। মধুর 'স্নবারি'র পূর্ণ পরিচয় এই চিঠির ছত্রে ছত্রে।

মাইকেলের মনে সকল প্রকার খ্যাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ খ্যাতি ছিল কবি-খ্যাতি কিংবা কবি-খ্যাতিকেই তিনি একমাত্র খ্যাতি মনে করিতেন। স্বদেশের ভাবী গৌরবের কথা বলিতে গিয়া কবি-খ্যাতির কথাই মনে পড়িয়াছে ; এই সব ছাত্রদের মধ্যে একজনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মধুর চিত্তে লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না।

কবিতা রচনা করিয়াই মধু সন্তুষ্ট ছিলেন না ; এ দেশের কোন কোন কাগজে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত ; কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি কোথায় ? ইংলণ্ডে তাঁহার যাইতে না হয় দুই চারি দিন দেরি আছে, কিন্তু তাঁহার কবিতার যাইতে বাধা কি ? বরঞ্চ, তাঁহার কবিতা আগে গিয়া সেখানে আসন প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। তিনি নিয়মিতভাবে কবিতা 'বেণ্টলিস মিসেলেনি', 'ব্ল্যাকৃউড ম্যাগাজিনে' পাঠাইতেন। ভোলানাথ চন্দ্রের দলের 'আহা মরি মরি' সত্ত্বেও ইংরেজ সম্পাদকেরা ভুল করেন নাই ; মাইকেলের একটি কবিতাও বিলাতী কাগজে ছাপা হয় নাই। তাঁহার জীবনীকার লিখিতেছেন—"নিজের রচিত কবিতা শৈশব-সুহৃৎদিগকে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার তৃপ্তিবোধ হইত না ; তিনি ওয়ার্ডস্বার্থের ন্যায় কবিকুল-তিলককে উদ্দেশ করিয়া কবিতা উৎসর্গ করিতেন।" ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্য-মাহাত্ম্য

উপলব্ধি করিবার মন মধুর ছিল মনে হয় না ; তিনি ওয়ার্ডস্বার্থের বিশেষ ধার ধারিতেন না। কিন্তু রাজকবি ওয়ার্ডস্বার্থ! সে যে স্বতন্ত্র কথা। সে আসনে কোন চতুর্থ শ্রেণীর কবি থাকিলে মাইকেল তাঁহাকেও সমান আগ্রহে কবিতা উৎসর্গ করিতেন। কবিত্ব কাম্য, কিন্তু রাজকবি—সে যে একেবারে কামনার চরম! মাইকেল পরবর্ত্তী জীবনে বর্দ্ধমানের ও কৃষ্ণনগরের রাজাদের নিজেকে রাজকবিরূপে নিয়োগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

বনবাস

"তুমি কি কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠাইতে পার না? মাতৃভাষা দ্রুত ভুলিতে বসিয়াছি।"

"পুরাপুরি সাহিত্যিক হইতে হইলে মাসিক কয়েক শত টাকার একটি ভদ্ররকম চাকুরির আমার প্রয়োজন। কে আমাকে তাহা দিবে? ভারতবর্ষে এমন কি কেহ নাই? সময়ে সব বুঝা যাইবে।"

কলিকাতার একটি অট্টালিকার কক্ষে বসিয়া গৌরদাস বসাক একখানা চিঠি পড়িতেছিলেন। পিয়নের কর-লাঞ্ছনে খামখানাতে বিচিত্র পথের ইতিহাস অঙ্কিত। লেখক বলিতেছেন—

"প্রিয়তম বন্ধু, তুমি আমাকে ভুল বুঝিয়াছ, আমার পক্ষে তোমাকে ভোলা অসম্ভব; তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার জানাশোনা লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করিয়া তোমার কথাই মনে হইতেছে; কলিকাতা ত্যাগ করিবার সময়ে বিরক্তি ও উদ্বেগে আধ-পাগলের মত হইয়াছিলাম। মনে করিও না যে, তোমাকেই কেবল বিদায়জ্ঞাপক পত্র দিই নাই; দুইতিনজন ছাড়া কাহাকেও আমার মনের কথা বলি নাই। এখানে আসিবার পরে, জীবিকা উপায়ের জন্য প্রথমে খুব চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, বন্ধুবিহীন বিদেশীর পক্ষে ইহা বড় সহজ কথা নয়। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমার বিপদ এক রকম কাটিয়া গিয়াছে; এখন আমি জাহাজের সেই নাবিকের মত, যে ঝড়ের মধ্যে কোন একটা বন্দরে আসিয়া আশ্রয় পাইয়াছে। এই দেখ, কেমন একটা উপমা দিলাম।

"আমার বিবাহ সম্বন্ধে যে সংবাদ পাইয়াছ, তাহা সত্য। মিসেস ডি. জাতিতে ইংরেজ। তাঁহার পিতা এই প্রদেশের একজন নীলকর ছিলেন। আমাদের বিবাহের পথে যথেষ্ট বাধা ছিল; তাঁহার বান্ধবেরা এ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে, এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আমি একখানা কাব্য লিখিতে সমর্থ হইয়াছি; গ্রন্থকার হিসাবে ইহাই আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ। কাব্যখানা দুই সর্গে সমাপ্ত; নাম 'ক্যাপ্‌টিভ লেডি'। ইহাতে বারো শত ছত্র ভাল, মন্দ, মাঝারি শ্লোক আছে—আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, ইহা তিন সপ্তাহেরও কম সময়ে লিখিত।

"আমি ইহা স্থানীয় একখানা কাগজের জন্য লিখিয়াছিলাম; ইহার সম্পাদক ভারতবিখ্যাত ব্যক্তি; তিনি আমার গুণগান আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এখানকার অনেক গুণী লোক, যাহাদের মতামতের উপর নির্ভর করা যায়, তাঁহারা গ্রন্থাকারে ছাপাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। কাজেই দেখ, ছাপাখানার দৈত্য-দানবেরা আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বন্ধু, তোমাকে একটি অনুরোধ, এখানে সামান্য কয়েকজন লোককে আমি জানি; কাজেই বই ছাপিবার খরচা উঠাইবার আশা এখানে করিতে পারি না। তুমি কি কয়েকজন গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পার না? তুমি ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই পার। দুই টাকা গ্রন্থের মূল্য; আমাদের স্কুল-কলেজের বন্ধুদের মধ্য হইতেই জন চল্লিশেক সংগ্রহ হইতে পারে। তুমি শীঘ্রই আমাকে জানাইবে, কতগুলি বই তোমার দরকার।...এইবার দেখাও, তোমার ভালবাসা কত! আমি সত্যই বলিতেছি, বই হইতে লাভ করিবার ইচ্ছা আমার নাই, কেবল ক্ষতি না হয়—ইহাই চাই।...

"গৌরদাস, তুমি আমাকে শ্রীরামপুর সংস্করণের কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আর কাশীদাসী মহাভারত পাঠাইতে পার না কি? বাংলা ভুলিয়া যাইবার মত হইয়াছে।

পুনশ্চ—

"অফিসে বসিয়া চিঠি লিখিতেছি; বাসায় ফিরিয়া মিসেস দত্তকে তোমার চিঠি দেখাইব, তিনি খুব খুশি হইবেন। মেয়েটি খুব ভাল।"

লেখকের ঠিকানা উল্লেখযোগ্য; মাদ্রাজ মেল অর্ফ্যান অ্যাসাইলাম; ব্ল্যাকটাউন; তারিখ ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯।

গৌরদাস পত্র পড়িয়া হাসিলেন, মধুসূদন ঠিক তেমনিই আছেন, একটুও বদলান নাই, এমন কি বাংলা ভুলিবার গৌরবও আগের মত। তবু তিনি খুশি হইলেন—অনেকদিন পরে বন্ধুর সন্ধানে।

মাইকেল গৌরদাসের চিঠি পাইয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, গৌর 'ক্যাপ্‌টিভ লেডি' সম্বন্ধে কি লেখে দেখা যাক্; এক সময়ে সে তো আমার কাব্যের সমঝদার ছিল—এখনও আছে কি না, আজ তাহা বোঝা যাইবে। মধু আগ্রহের সহিত চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন—

"তোমার প্রেরিত 'ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডি' পাইবামাত্র বহুদিনের প্রতীক্ষাজাত আগ্রহের ভরে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। আমার মনে যে আনন্দাতিশয্য হইয়াছিল, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। তোমার কিশোর প্রতিভার প্রথম অর্ঘ্যস্বরূপ এই কাব্যকে জয়ধ্বনি দ্বারা বরণ না করিয়া উপায় নাই; সেই সঙ্গে মনে পড়ে সখ্যরসের দ্বারা আপ্লুত আমাদের বন্ধুত্বের দিনগুলি—আমার জীবনের আনন্দময় কিন্তু সংক্ষিপ্ত শ্রেষ্ঠদিনগুলি।

তোমার কাব্যপাঠ সমাধা করিয়া তোমার প্রতিভা সম্বন্ধে আমার ধারণা উচ্চতর হইয়াছে, এবং আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্যে তুমি যুগান্তর আনয়ন করিবে। আজ আর না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, তোমার প্রতিভা যে কেবল তোমাকে অমরত্ব দিবে তাহা নয়, আধুনিক বঙ্গদেশকেও গৌরবান্বিত করিবে। ইহা স্তুতিবাদ নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোমার লেখক-জীবন আমি পরম আগ্রহের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিব।"

মধু ভাবিলেন, হ্যাঁ, গৌরদাস কাব্যরসিক বটে। এতখানি গৌরের কাছে তিনি আশা করেন নাই। এই প্রশংসাপূর্ণ চিঠিতে অন্যান্য প্রশংসার কথা মনে পড়িয়া গেল।

মাইকেলের মনে পড়িল, 'এথিনিয়ম' পত্রে একজন সমালোচক লিখিয়াছেন—"এ কাব্যে এমন অনেক অংশ আছে, যাহা স্কট ও বায়রন লিখিলে গৌরব বোধ করিতেন।"

আবার মনে পড়িল, একজন সমালোচক গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন—"এই অপূর্ব্ব কাব্যখানি চব্বিশ বৎসরের একজন যুবকের রচনা; কাজেই ইহার পাতায় পাতায় বিদেশী ভাষার উপরে লেখকের অসাধারণ কৃতিত্বের কথা মনে পড়ে। শেলী বা বায়রন মাতৃভাষায় লিখিতেছেন না, একটি বাঙালী যুবক বিদেশী ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতেছেন। সাহিত্যিক প্রতিভা না থাকিলে এরূপ লেখা যায় না। ইহার ছত্রে ছত্রে যে ভাষার নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, সে কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহার ভাবসম্পদ সত্যকার কবি ছাড়া কেহ লিখিতে পারিত না। অংশবিশেষ লর্ড বায়রন বা সার্ ওয়াল্টার স্কটের শ্রেষ্ঠ অংশের সমতুল্য; ইহা কোন অত্যুক্তি নয়।"

মাইকেল যে কাব্য-খ্যাতির জন্য বাল্যকাল হইতে লালায়িত, তাহারই ক্ষীণ রেখা যেন দিক্চক্রবালে তিনি দেখিতে পাইলেন; কিন্তু গৌরদাসের পত্রে আরও বেশি আশা করিয়াছিলেন; গৌরদাস যেমন কাব্য-রসিক, তেমন ব্যবসায়ী নন, বই বিক্রয় সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই। কত কপি দরকার তাহার উল্লেখ নাই; কি বিপদ!

'ক্যাপ্‌টিভ লেডি' প্রকাশিত হইলে মাইকেল প্রচুর প্রশংসা লাভ করিলেন, কিন্তু তাহাতে ছাপাখানার বিলের চিন্তার লাঘব হইল না; ঋণোদ্‌ভ্রান্ত কবি এক হাতে প্রশংসাপত্র, অন্য হাতে ছাপাখানার বিল লইয়া বসিয়া রহিলেন।

এই গ্রন্থ-প্রকাশ মধুর মাদ্রাজ-প্রবাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা; প্রাক্-মেঘনাদবধ পর্ব্বের শ্রেষ্ঠ ঘটনা; কিন্তু মাদ্রাজে কবির জীবনযাত্রা আরও বিশদভাবে না জানিতে পারিলে, তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে বোঝা যাইবে না।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজে যাত্রা করেন, সেখানে পৌঁছিয়া নিঃসহায়, বিদেশী, অপরিচিত এই বাঙালী যুবক প্রথমে বড় অর্থকষ্টে পড়িয়াছিলেন, অবশেষে কতকগুলি সহৃদয় দেশীয় খ্রীষ্টানের চেষ্টায় তিনি অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এক বিদ্যালয়ে সামান্য একটি চাকুরি পাইলেন। অনাথ বালক-বালিকাদের অনাথ শিক্ষক।

এই বিদ্যালয়ে রেবেকা ম্যাক্টাভিস নামে একটি বালিকা পড়িত; মধু তাহার প্রেমে পড়িলেন। বালিকা একেবারে অনাথ ছিল না, তাহার আত্মীয়-স্বজন এই বিবাহে আপত্তি তুলিলেন, বোধ করি সেইজন্য মধুর রোখ চাপিয়া গেল, অবশেষে অ্যাড্‌ভোকেট-জেনারেল নর্টনের সাহায্যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

মাইকেলের অর্থভাগ্য ছিল না, কিন্তু বন্ধুভাগ্য ছিল; চিরদিন তিনি এমন বন্ধু পাইয়াছেন, যাঁহারা সব রকমে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন; অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারেন নাই, কারণ মধুর আত্মনাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

জর্জ নর্টন এই সময়ে মাইকেলের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিলেন; ইঁহাকে না পাইলে মধুর মাদ্রাজ-প্রবাস সম্পূর্ণ অন্য আকার গ্রহণ করিত।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যাপ্‌টিভ লেডি' 'মাদ্রাজ সার্কুলেটার' পত্রে প্রকাশিত হয়; তখন মধুসূদন নিজের নাম প্রকাশ না করিয়া "টিমথি পেন পোয়েম" নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন। কাব্যখানি গ্রন্থাকারে বাহির হইলে জর্জ নর্টনকে উৎসর্গীকৃত হয়।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন 'হিন্দু ক্রনিক্‌ল্‌' নামে সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক হন; এই পত্র ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিসাপ্তাহিকে পরিণত হয়।

১৮৫১-এ মধুসূদনের মাতার মৃত্যু হয়। এই সংবাদে তিনি গোপনে একবার কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তখন তিনি পিতা ছাড়া আর কাহারও সহিত দেখা করেন নাই, এমন কি গৌরদাসও এ সংবাদ তাঁহার মাদ্রাজ-প্রত্যাবর্ত্তনের অনেক পরে পাইয়াছিলেন। মাইকেলের জীবনে এই রকম একটা রহস্যকূট আছে, যাহার সম্যক্‌ সত্য আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাই-স্কুল বিভাগে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। প্রধানত, ইহা জর্জ নর্টনের চেষ্টায় হইয়াছিল—নর্টন সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন।

* * *

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয়, এই সময়ে মধুসূদনের মানসিক অবস্থা সুস্থ থাকিবার কথা; অর্থের আপাত-অভাব দূরীভূত; কবিখ্যাতি আশাতীত পরিমাণে পাইয়াছেন,

ইংরেজ রমণীকে বিবাহ করিবার জন্য তাহার ধর্ম্মত্যাগ—এখন তিনি ইংরেজ রমণীর স্বামী; পুত্র-কন্যাও জন্মিয়াছে, এমন কি ছাপাখানার বিলের তাড়নাও তেমন দুঃসহ নয়। কিন্তু মধুসূদনের মনে শান্তি ছিল না।

এই সময় এক মাদ্রাজী বন্ধুকে দুইটি সনেট লিখিয়া তিনি উপহার দিয়াছিলেন, সনেট দুইটিতে কবির মনের গভীর অশান্তি ও চাঞ্চল্যের পরিচয় আছে।

কবির অশান্তি এমন মর্ম্মান্তিক যে, কবিযশও হৃদয়কে নাড়া দিতে পারে না; জোয়ারহীন সমুদ্রের মত কবির চিত্ত নিস্পন্দ।

নিজের অবস্থাচক্রকে ছিন্ন করিবার প্রয়াস মধুসূদনের চরিত্রের অন্যতম বিশেষ আকৃতি; বারংবার অবস্থার দুর্ভেদ্য প্রাকারকে লঙ্ঘন করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন; এই প্রয়াস তাহাকে বহুদূরে আনিয়া ফেলিয়াছে, স্বধর্ম্ম হইতে, স্বদেশ হইতে—বহুদূরে।

অর্থের অভাব তাঁহার নিকট পীড়াদায়ক, আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয়, আর দশজনের অর্থাভাবে যে জাতীয় কষ্ট, মধুরও বুঝি সেইরূপ; কিন্তু তাহা নয়। অর্থ তাহাকে মানসলোক গড়িবার উপাদান যোগাইবে! বস্তুর অভাবে শিল্প যে রূপ পাইতেছে না! কাজেই এই দুর্ভিক্ষে তাহার অন্তরলোক গভীরতর বেদনায় পীড়িত।

মাঝে মাঝে দূরে স্বর্ণকিরণ-পংক্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, কিন্তু পরদিনের প্রভাতে তাহার আর কোন চিহ্ন থাকে না; মধুসূদন চিরদিন এই ভাবে বিড়ম্বিত হইয়াছেন; প্রত্যেক শিল্পীই অল্প-বিস্তর এই বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত সনেট দুইটি হইতে বুঝিতে পারা যায়, বাংলা দেশ হইতে মাদ্রাজে আসিয়া কবির মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; সত্য কথা বলিতে কি, মধুর চিন্তালোক চিরদিন একই রকম, আলোছায়ায়, সত্যমিথ্যায় চিহ্নিত ছিল। চিন্তা-জগতে কোনরূপ পরিবর্ত্তন তাঁহার হয় নাই; চিন্তারাজ্যে তাঁহার চিরশৈশব, শিল্পজ্ঞান তাহার পর্ব্বে পর্ব্বে বাড়িয়াছে; কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বেও মধুসূদন চিৎশক্তিতে শিশু ছিলেন; শিশুরা কল্পনা ও বাস্তবে প্রভেদ বুঝিতে পারে না, সত্য মিথ্যা তাহাদের কাছে সগোত্র; বয়স হইলে এই শৈশবের সত্যযুগ কাটিয়া যায়, মধুর কখনও তাহা যায় নাই; সেইজন্য তাঁহার কাছে জীবনে ও স্বপ্নে, সত্যে ও মিথ্যায়, আকাঙ্ক্ষায় ও তথ্যে, ঋণদানে ও ঋণগ্রহণে, পাওনায় ও দেনায় কোন ভেদ ছিল না। সেইজন্যই নানা প্রকার উদ্বেগের মধ্যেও তিনি লিখিতে পারিতেন—

“বোধ হয় তুমি জান না যে, আমি দৈনিক অনেকটা সময় তামিল পড়িবার জন্য ব্যয় করি। যে কোন স্কুলের বালকের চেয়েও আমি পড়াশুনায় বেশি ব্যস্ত। আমার পাঠ্যলিপি দেখ—৬-৮টা হিব্রু; ৮-১২টা স্কুল; ১২-২টা গ্রীক; ২-৫টা তেলেগু ও সংস্কৃত;

৫-৭টা ল্যাটিন ; ৭-১০টা ইংরেজী। আমি কি মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছি না ?"

মধুসূদন বন্ধুবান্ধবদের অনেককেই 'ক্যাপ্‌টিভ লেডি' পাঠাইয়াছিলেন। বন্ধু ছাড়া শিক্ষক, পরিচিত, নামশ্রুত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেককে এই কাঁব্য তিনি উপহার দিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে বাংলার শিক্ষাবিভাগের সভাপতি বেথুন সাহেবকেও এক কপি প্রেরিত হইয়াছিল।

'বেঙ্গল হরকরা' নামে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এক সংবাদপত্রে মধুসূদনের কাব্যের তীব্র শ্লেষপূর্ণ এক সমালোচনা বাহির হইল ; ইহার তীব্রতা ও শ্লেষ বাদ দিলে সমালোচনাকে অন্যায় বলা চলে না। যখন বহু সংবাদপত্র হইতে উচ্ছ্বসিত সমালোচনার করতালি উঠিতেছিল, সে সময় কোন কোন কাগজ যে নিন্দার অত্যুক্তি করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে ?

বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধ পড়িয়া মধুসূদনের আরও রোখ চাপিয়া গেল। তিনি গৌরদাসকে লিখিলেন—

"আমি দেখিতেছি তোমাদের 'হরকরা' কাগজ বড়ই রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অভিশপ্ত রাস্কেল ! আমি বীরের ন্যায় কোমর বাঁধিয়াছি···কিন্তু এমন সব লোকের প্রশংসা আমি অর্জ্জন করিয়াছি, যাহাতে একটু নিন্দা আমি অনায়াসে সহ্য করিতে পারি।"

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে গৌরদাসের মারফতে আর একখানি পত্র তাঁহার হাতে আসিল, ইহা তাঁহার অটল আত্মবিশ্বাসকে শিথিল করিয়া দিল। মধুর তৎকালীন মনোভাব তাঁহারই লিখিত একটি ছত্র দ্বারা প্রকাশ করা যায়—

"একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে ?"

বেথুন সাহেব 'ক্যাপটিভ লেডি' উপহার পাইয়া গৌরদাসকে লিখিতেছেন —

"আপনি এই উপহারের জন্য আপনার বন্ধুকে আমার ধন্যবাদ জানাইবেন। অপ্রীতিকর হইলেও একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না, এ কথা আমি আপনাদের দেশবাসীদের অনেককে বলিয়াছি, তিনি ইংরেজী কবিতা না লিখিয়া বাংলায় রচনা করিলে বুদ্ধিমানের কাজ করিবেন। ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা দেখাইবার জন্য মাঝে মাঝে এরূপ রচনা চলিতে পারে ; কিন্তু যদি তিনি ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করিয়া যে জ্ঞান ও শিল্পবোধ লাভ করিয়াছেন, তাহা বাংলা ভাষার চর্চ্চায় নিয়োগ করেন, তবে

মাতৃভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন—অবশ্য কাব্য-রচনাই যদি জীবনে আদর্শ বলিয়া মনে করেন। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি তাহাতে মনে হয়, অশ্লীলতা ও স্থূলতায় ইহা পূর্ণ। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কবির পক্ষে শক্তিনিয়োগের এমন ক্ষেত্র আর নাই, তিনি স্বভাষার মধ্যে সাহিত্যিক উচ্চ আদর্শ সৃষ্টি করিতে পারেন। অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেও প্রকৃত কাজ করিবেন—এই ভাবেই ইউরোপের সব জাতির সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে।"

মাইকেল এই পত্র পড়িয়া কি ভাবিয়াছিলেন—ইহা তো 'হরকরা'র পরশ্রীকাতরতা নয়; ইহা তো ইংরেজী-অনভিজ্ঞ পাঠকের অজ্ঞতা নয়, ইহা তো রসবোধের অভাব নয়; যে ইংরেজী সাহিত্য তাহার আদর্শ, সেই সাহিত্যের, সেই জাতির অন্যতম একজন উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিতের অভিমত!

কিন্তু বেথুন সাহেবের এই অপ্রীতিকর অভিমতের উপর অযথা গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে; যেন এই উপদেশ না পাইলে মধুসূদন কখনও বাংলা ভাষায় রচনা করিতেন না। বস্তুত বেথুনের উপদেশ মূল্যবান হইলেও ইহাকে মাইকেলের মতপরিবর্ত্তনের পক্ষে একেবারে অনিবার্য্য বলা চলে না।

মাইকেলের যে উচ্চস্তরের শিল্পবোধ ছিল, তাহাতে তিনি অনতিকালমধ্যে নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেন, ইংরেজী ভাষায় তাহার আত্মবিকাশ অসম্পূর্ণ হইতেছে; নিজের এই সহজাত শিল্পবোধই একদা মাতৃভাষার দিকে তাহাকে ফিরাইয়া আনিত; কিংবা বেথুনের পত্র পাইবার আগে হইতেই সেই দিকে তাহার মন ফিরিতেছিল।

বেথুনের চিঠির তারিখ ২০এ জুলাই, ১৮৪৯; মধুসূদন একখানি পত্রে গৌরদাসের কাছে কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার তারিখ ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯। কবির মনের অবচেতন লোকে এইরূপ একটা আন্দোলন চলিতেছিল বলিয়াই তিনি পুরাতন বন্ধু কাশীদাস ও কৃত্তিবাসকে স্মরণ করিতেছিলেন; বিকালে দুইটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছিলেন; এই আন্দোলন-জাত অশান্তির খানিকটা পূর্ব্বোক্ত সনেট দুইটিতে প্রকাশিত হইয়াছে। মাইকেলের অন্তরের রসলোকে যে বিরাট দৈত্যশিশু খেলা করিতেছিল, ইংরেজী ভাষার কৃত্রিম খেলাঘরে সে যেন অতিকষ্টে হাত পা নাড়িতেছিল।

বেথুনের পত্রকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহা সত্য হইলে মধু মাদ্রাজেই বাংলা রচনা করিতে আরম্ভ করিতেন। দেশে ফিরিয়া অনেকটা পরিমাণে আকস্মিকভাবে তাহাকে বাংলা কাব্য লিখিতে হইয়াছিল। তবে বেথুনের পত্রে এইমাত্র করিয়াছিল যে, কবির মনে অজ্ঞাতসারে যে সংশয় ছিল, বেথুন স্পষ্টভাবে তাহাকে সমর্থন

করিয়াছিলেন। মাইকেলের শিথিলপ্রায় ইংরেজী সরস্বতীর বেদীতে এই পত্রাঘাত ফাটল ধরাইয়া দিল। কিন্তু আশু ফল ফলাইতে পারিল না। মাইকেলের দেশে ফেরা যেমন আকস্মিক, বাংলা রচনা আরম্ভ করাও তেমনই আকস্মিক। দেশে না ফিরিলে তিনি দেশী ভাষাতেও ফিরিতে পারিতেন না।

মাদ্রাজ-প্রবাসের শেষ বৎসর তিনি পত্নীর সহিত বিবাহবন্ধন ছিন্ন করেন।

অল্পদিন পরেই তিনি হেন্‌রিয়েটা সোফিয়া নামে একটি ফরাসী মেয়েকে বিবাহ করিলেন; ইঁহার পিতা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। মাইকেলের পত্নী বলিতে সাধারণত ইঁহাকেই বুঝায়।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি মধুর পিতার মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজন মধুকে মৃত মনে করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি ভাগাভাগি করিয়া লইবার চেষ্টায় থাকে। সে বৎসর ডিসেম্বর মাসে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মাদ্রাজে যান; গৌরদাস মধুর পিতার মৃত্যুসংবাদ তাঁহার মারফতে পাঠান ও অবিলম্বে দেশে আসিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন।

মধুসূদন মাদ্রাজ হইতে রওনা হইয়া ২রা ফেব্রুয়ারি কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন। মাদ্রাজ ত্যাগ করিবার সময়ে তিনি ভাবিয়াছিলেন, মাত্র অল্প কিছু দিনের জন্য দেশে যাইতেছেন, কাজ মিটিলেই আবার ফিরিয়া আসিবেন।

মধুচক্র
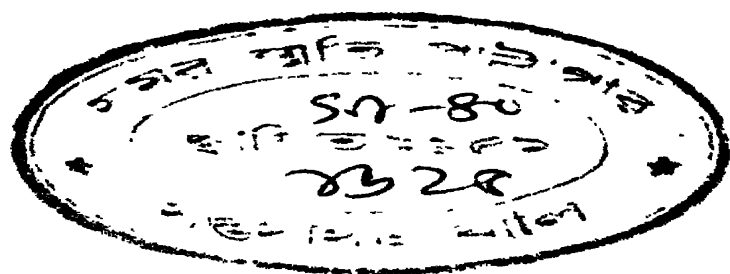
মাই ডিয়ার রাজ, ইহা নিশ্চয় আমাকে অমর করিয়া রাখিবে।"

'একজন গ্রীক কবি যে ভাবে লিখিত, সেই ভাবে লিখিতে চেষ্টা করিব।'
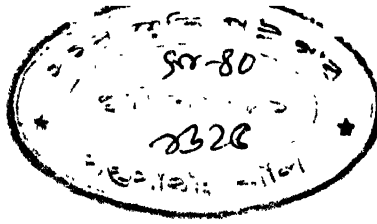
মধুসূদনের বন্ধুভাগ্য অপরিমেয়; অন্য কোন লোক হইলে মাদ্রাজ হইতে ফিরিবার পরে, আট বৎসর দেশে অনুপস্থিত থাকিবার পরে, হঠাৎ দেশে ফিরিয়া বিপদে পড়িত; মধুসূদনকে সেই দুর্ভাগ্য হইতে বান্ধবেরা রক্ষা করিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁহাকে চাকুরি সংগ্রহ করিয়া দিয়া তাঁহারা কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পদিনের মধ্যে তিনি পুলিস-আদালতের হেড-ক্লার্কের চাকুরি পাইলেন, কিশোরীচাঁদ মিত্র তখন পুলিস-আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট; উভয়ে বন্ধু।

মধু জানিতেন, তাঁহার বন্ধুরাও জানিতেন, এ চাকুরিতে তিনি কখনও স্থায়ীভাবে থাকিবেন না—এ তাঁহার দুঃসময়ের একটা সাময়িক আশ্রয়। সিংহাসনে যাহার দাবি, তাহাকে নিম্নাসনে বসাইতে পারিলে লোকে কৃতার্থ হয়; সে-ও কিছু কৌতূহলে, কিছু কৌতুকে, কিছু বা কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞায় সে স্থান অধিকার করে। যোগ্যকে অযোগ্য আসন দিয়া মানুষে আনন্দ লাভ করে, যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন ঘটাইতে তাহার তেমন আনন্দ নয়।

এই সময়ে মধুসূদন কিশোরীচাঁদের দমদমের বাগান-বাড়িতে কিছুকাল ছিলেন; সেখানে সন্ধ্যাবেলা কিশোরীচাঁদের অনেক বন্ধুবান্ধব আসিতেন, নানা গল্পগুজব, তর্ক-আলোচনা চলিত; শেষে পান-ভোজন হইয়া সভান্ত ঘটিত।

সেখানে একদিন প্যারীচাঁদ মিত্র—বাংলা সাহিত্যের টেকচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে মধুর বাংলা ভাষা লইয়া তর্ক বাধিয়া উঠিল। মধু বলিলেন, এ আবার আপনি কি আরম্ভ করলেন! মুখের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা ক'রে সাহিত্যের মহিমা খর্ব্ব করতে যাচ্ছেন।

টেকচাঁদ বলিলেন, তুমি বাংলা ভাষার কি বুঝবে? তবে জেনে রাখ, আমার প্রবর্ত্তিত এই রচনাপদ্ধতিই বাংলা সাহিত্যে নির্ব্বিবাদে চলবে।

মধুসূদন ভাষার পোশাকী ধরন তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না, ভাষার আটপৌরে চালের প্রশংসা শুনিয়া প্রচুর বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, সংস্কৃত থেকে যতদিন না প্রচুর আমদানি করছেন, ততদিন এ ভাষা মেছুনীদের ভাষা বই আর কিছু নয়।

তারপর ভবিষ্যৎ-ভাষণের গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিলেন, দেখবেন, আমি যে ভাষার সৃষ্টি করব, তাই চিরস্থায়ী হবে।

উপস্থিত ভদ্রলোকেরা তাঁহার এই উক্তিকে একটা মধুসূদনীয় পরিহাস বলিয়া মনে করিলেন, কারণ তখন তিনি এক ছত্রও বাংলা লেখেন নাই, আর 'আলালের ঘরের দুলাল' তখন প্রকাশিত হইয়াছে।

পুলিস-আদালতের কেরানি-পদে তাঁহার বেশিকাল থাকিতে হয় নাই, কিছুদিন পরে তিনি উক্ত আদালতের দোভাষীর পদটি পাইলেন। তখন তিনি দমদমের বাগান-বাড়ি ছাড়িয়া ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডে উঠিয়া আসিলেন। এই বাড়িতেই তাঁহার অধিকাংশ কাব্য লিখিত হয়। দোভাষীর কাজ করিবার সময়ে মধুসূদন আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে পাইকপাড়ার রাজারা বেলগাছিয়ার নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী নাটক' নির্ব্বাচন করেন। সে সময়ে এই সব অনুষ্ঠানে বড় বড় ইংরেজ কর্ম্মচারীরা নিমন্ত্রিত হইতেন, কাজেই তাঁহাদের হাতে দিবার জন্য 'রত্নাবলী'র ইংরেজী অনুবাদ করা আবশ্যক হইল। মধুসূদন ভাল ইংরেজী লেখেন, পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয়—ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ জানিতেন। কাজেই তাঁহারা গৌরদাসকে ধরিয়া মধুসূদনের উপরে এই ভার দিলেন। মধু যে কাজ লইতেন, তাহাতে প্রাণ ঢালিয়া দিতেন; অল্পদিনের মধ্যে 'রত্নাবলী'র অনুবাদ শেষ হইল; বলা বাহুল্য, তাঁহার অনুবাদ অনবদ্য হইল। সাহেব-সুবো হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙালী দর্শক ও পাঠক সকলে অনুবাদ পড়িয়া সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু অনুবাদক সন্তুষ্ট হইলেন না।

তিনি অনুযোগের সুরে গৌরদাসকে বলিলেন, রাজারা একটা বাজে নাটকের জন্যে এত টাকা খরচ করছেন দেখে দুঃখ হয়।

গৌরদাস বলিলেন, কি করা যায় বল? বাংলায় যে এর চেয়ে ভাল আর কিছু নেই।

তখন মধুসূদন কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, ভাল নেই? আচ্ছা, আমি নাটক লিখব।

গৌরদাস তাঁহার চেয়েও বেশিক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, ভালই। ইচ্ছে হ'লে চেষ্টা ক'রে দেখতে পার।

মধুসূদন তাহার পরের দিন হইতেই সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান ও অন্যান্য কাব্য নাটক লইয়া বাংলা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

শিক্ষিত বাঙালী-মহলে রাষ্ট্র হইল, সাহেব মধুসূদন বাংলা নাটক লিখিতেছেন। বন্ধুদের বিস্ময়, পণ্ডিতদের উপহাস ও অবজ্ঞার মধ্যে তিনি একমনে একটির পরে একটি অঙ্ক সমাপ্ত করিয়া যাইতে লাগিলেন।

নাটক লেখা শেষ হইলে পাইকপাড়ার সভাপণ্ডিত প্রেমচাদ তর্কবাগীশের হাতে দেওয়া হইল; ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, যেখানে দোষ-ত্রুটি আছে মনে করেন, একটু দাগ দিয়ে রাখবেন।

কয়েকদিন পরে প্রেমচাদ তর্কবাগীশ মধুসূদনের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—দাগ দিতে গেলে আর কিছু থাকবে না। তবে কিনা আমি যে চোখে দেখছি, সে রকম চোখ আর গোটা দুই লোকের আছে; আমরা ফতে হয়ে গেলে তোমার বই খুব চ'লে যাবে—বাহবা পড়বে।

তর্কবাগীশের দল যাহাই বলুন না কেন, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর দল মধুসূদনের নাটক 'শর্ম্মিষ্ঠা'কে আদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন; তাঁহারা 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' ও 'রত্নাবলী'র অন্ধকূপ হইতে বাহিরে আসিয়া 'শর্ম্মিষ্ঠা'র কল্পনামুখী মুক্ত বাতায়নে হাঁফ ছাড়িবার সুযোগ পাইলেন। অত্যন্ত উৎসাহে 'শর্ম্মিষ্ঠা'র রিহার্সাল চলিতে লাগিল এবং অবশেষে একদিন, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর, বেলগাছিয়ার নাট্যশালায় 'শর্ম্মিষ্ঠা'র প্রথম অভিনয় হইয়া গেল।

সেকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালীরা 'শর্ম্মিষ্ঠা'কে শ্রেষ্ঠ বাংলা নাটক বলিয়া ঘোষণা করিলেন, ইহাতে আপত্তির কিছুই নাই—কারণ 'শর্ম্মিষ্ঠা'ই ছিল সেকালের একমাত্র নাটক।

মধুসূদন 'শর্ম্মিষ্ঠা'র প্রারম্ভে একটি কবিতা লিখিয়া জুড়িয়া দিয়াছিলেন। মধুসূদনকে এ পর্য্যন্ত কেহ 'ঋষি' বলে নাই; কিন্তু বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ আলোচনা করিলে এই কবিতাটিতে মধুর ঋষি-দৃষ্টির প্রকাশ দেখা যাইবে।—

"মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়।
যে সময়, দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারত-ভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
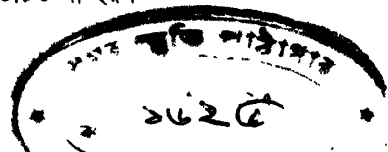
উঠ, ত্যাজ ঘুম-ঘোর, হইল, হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে, বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু, মন ক্ষয়।
মধু কহে, জাগো মাগো, বিভুস্থানে এই মাগো
সুরসে প্রবৃত্ত হোক তব তনয় নিচয়।"

মধুসূদন ও দীনবন্ধু একবার বঙ্গীয় নাট্যসরস্বতীর অকালে নিদ্রাভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তারপরে তিনি বিরক্ত হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়াছেন। শীঘ্র আর জাগিতেছেন না। আদৌ জীবিত আছেন কি ?

বাঘে একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পাইয়াছে, আর সে কি নিরস্ত হয়! 'শর্ম্মিষ্ঠা'র জয়মাল্য কণ্ঠে শুকাইতে দিবার লোক মধুসূদন ছিলেন না; তিনি নূতন নূতন উদ্যমে প্রতিভাকে চালিত করিতে লাগিলেন।

'শর্ম্মিষ্ঠা'র রিহার্সাল চলিতেছে, ঈশ্বরচন্দ্র মধুকে একখানা প্রহসন লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; মধুসূদন যেন প্রস্তুত হইয়া ছিলেন; তিনি অল্পদিনের মধ্যে 'একেই কি বলে সভ্যতা' লিখিয়া ফেলিলেন। প্রতিভার গতি নিয়মতন্ত্র মানে না; একখানা প্রহসন লিখিয়া মধুসূদন থামিলেন না, আরও একখানা লিখিয়া বসিলেন—'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'।

বোধ হয় প্রথমখানার মধ্যেই দ্বিতীয়খানার সম্ভাবনা ছিল; 'একেই কি বলে সভ্যতা' ইংরেজের অনুকরণকারী নব্য বাঙালীর প্রতি বিদ্রূপ; কিন্তু ইহা তো কেবল বাঙালী-সমাজের চিত্রপটের অর্দ্ধেক; কাজেই 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' সেই চিত্রপটকে সম্পূর্ণ করিল; প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে যে সামাজিক শিথিলতা ছিল, তাহার উপরেও লেখকের বিদ্রূপ বর্ষিত হইল; মাইকেল নিরপেক্ষভাবে দুই হাতে দুইজনকে আঘাত করিলেন; তিনি যে প্রকৃত সব্যসাচী।

এই অত্যল্পকালের মধ্যে একখানা নাটক ও দুইখানা প্রহসন লিখিয়া ফেলিয়াও মধুসূদনের প্রতিভার ক্লান্তি ছিল না—তিনি নবজাত গরুড়ের মত নিত্যনূতন খাদ্যের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন. মধুসূদন তাঁহার চতুর্থ নাটক 'পদ্মাবতী' আরম্ভ করিলেন।

'পদ্মাবতী'র কাহিনী-অংশ মূলত গ্রীক; এই গ্রীক উপাখ্যানকে যতদূর সম্ভব ভারতীয় পরিচ্ছদ দেওয়া হইয়াছে। দুইটি কারণে 'পদ্মাবতী' নাটক মধুসূদনের প্রতিভার পতাকাস্থান। প্রথমত, এই নাটকেই তিনি প্রথম কয়েক ছত্রে অমিত্রছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন; দ্বিতীয়ত, পরবর্ত্তী সমস্ত নাট্যে ও কাব্যে ভারতীয় ও ইউরোপীয় ধারার যে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, তাহারও সূত্রপাত ইহাতে। বাহ্যদৃষ্টিতে 'পদ্মাবতী'কে খাঁটি ভারতীয় ধরনের নাটক মনে হইলেও ইহার মূল ভিত্তি গ্রীক-মনোভাব।

চারখানা নাটক লেখা হইল; বাংলা সাহিত্যে নাটকের অভাব কিছু পূর্ণ হইল; এই ভাবে নাটকের অভাব পূরণ করিতে গিয়া মধুসূদন নিজের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ও শক্তির কেন্দ্রকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, অমিত্রছন্দের স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া উচ্চশ্রেণীর নাটক রচনা সম্ভব নয়; নাটকের মাধ্যমস্বরূপ অমিত্রছন্দ আবিষ্কার করিতে গিয়া নাট্যকার মধুসূদন কবি মধুসূদন হইয়া পড়িলেন. সাহিত্যিক মধুসূদনের, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আর একটা যুগান্তকারী মোড় ফিরিয়া গেল।

মাইকেলের জীবনে পদে পদে আকস্মিকতা ও 'আয়রনি'। যে ভাবে তিনি জীবনযাপন করিবেন ভাবিয়াছেন, ঘটনাক্রমে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে, এক পথে তাহার সাধনা, অন্য পথে কৃতার্থতা। ইংরেজী ভাষায় কাব্য-রচনা আরম্ভ, বাংলা ভাষায় তাহার পরিসমাপ্তি; মূর, বায়রনের কাব্যাদর্শ—মিল্টন, হোমারের কাব্যাদর্শে পরিণত। জীবনের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, নিজেকে এমন ভাবে প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে স্বদেশের বিরাট মহাকাব্য রচনা করিতে পারেন।

মাইকেলের এ ইচ্ছা কেবল ঘটনাচক্রেই সফলতা লাভ করিয়াছে; ঘটনার এক চুল এদিক ওদিক হইলে মহাকাব্য কেন, কোন কাব্যই তাঁহার দ্বারা লেখা সম্ভব হইত না। এ বিষয়ে মিল্টনের সঙ্গে তাঁহার মিল আছে। মিল্টন কৈশোর হইতে একখানা মহাকাব্য লিখিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলেন; কিন্তু ঘটনার পরিবর্ত্তনে রাজনীতির আবর্ত্তে পড়িয়া বহুকাল কাটাইয়া দিলেন; মহাকাব্যের পরিবর্ত্তে ক্রমওয়েলের রাষ্ট্রনীতিকে সমর্থন করিয়া বাদানুবাদ রচনায় চোখের দৃষ্টিকে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন; মিল্টন অন্ধ হইলেন; ক্রমওয়েলীয় রাষ্ট্র ধূলায় মিশিল; রাজতন্ত্র পুনরায় স্থাপিত হইলে, অন্ধ, বেকার, অদৃষ্ট-লাঞ্ছিত কবি নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই যেন, জীবনের শেষে, জীবনের প্রারম্ভের আশাকে রূপ দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন. আর কিছুদিন ক্রমওয়েলীয়

রাষ্ট্রতন্ত্র চলিলে, 'প্যারাডাইস লস্ট' আর লিখিত হইত না। মাইকেলের জীবন ও কাব্যপরিণাম অনুরূপ।

বেলগাছিয়ার নাট্যশালায় 'রত্নাবলী' নাটকের রিহার্সাল যখন চলিতেছে, সেই সময় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মধুসূদনের মধ্যে হঠাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দের দোষগুণ লইয়া এক তর্ক বাধিয়া উঠিল।

মধুসূদন বলিলেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ যতদিন না বাংলায় প্রবর্ত্তিত হবে, ততদিন বাংলা নাটকের উন্নতির সম্ভাবনা দেখি না।

যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, বাংলাতে অমিত্রছন্দ প্রবর্ত্তনের বাধা, এ ভাষার স্বভাবের মধ্যেই আছে, কাজেই কখনও হবে ব'লে মনে হয় না।

বাধা শুনিয়া মধুসূদনের সমস্ত ব্যক্তিত্ব জাগিয়া উঠিল—তিনি বলিলেন, এ পর্য্যন্ত চেষ্টা হয় নি ব'লেই সম্ভব হয় নি।

—দেখুন না কেন, ফরাসী সাহিত্য বাংলার চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ, যতদূর জানি তাতেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ নেই।

সে কথা ঠিক—সাহেব মাইকেল বলিলেন—কিন্তু মনে রাখবেন, সংস্কৃত ভাষার দুহিতা বঙ্গভাষা ; তার পক্ষে কোন কাজই দুঃসাধ্য নয়।

—আপনি মনে রাখবেন, আমাদের শ্রেষ্ঠকবি ঈশ্বর গুপ্ত অমিত্রাক্ষরকে ঠাট্টা ক'রে লিখেছেন—

"কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি,
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভ'রে খাই।"

মধুসূদন হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, বুড়ো ঈশ্বর গুপ্ত অমিত্রাক্ষর লিখতে পারেন নি ব'লে আর কেউ পারবে না, তার কি মানে আছে ?

ঈশ্বর গুপ্ত তখনকার কালের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। আজও তাঁহার উল্লেখ করিবার সময়ে রসিকেরা তাঁহাকে অকৃত্রিম বাঙালী কবি বলিয়া থাকেন। অকৃত্রিম বাঙালী কবি কি পদার্থ গুপ্ত-রসিকেরাই জানেন।

মাইকেল ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিলেন, আচ্ছা, কেউ না লেখে, আমি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখব।

তারপরে যেন নিজের দুঃসাহসিকতাকে চাপা দিবার জন্যই বলিতে লাগিলেন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যে ভাষার নাড়ীর যোগ, তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

যতীন্দ্রমোহন হাসিয়া বলিলেন, বেশ। আপনি যদি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখতে পারেন, আমি তা নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত ক'রে দেব।

ইহা শুনিয়া মধুসূদন আনন্দে হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, তা হ'লে কদিনের মধ্যেই আমার কাছে থেকে অমিত্রাক্ষরের নমুনাস্বরূপ খানিকটা কাব্যের অংশ পাবেন!

কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র কিয়দংশ লিখিয়া যতীন্দ্রমোহনের কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

বলা বাহুল্য, যতীন্দ্রমোহন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া নিজের খরচে 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র প্রথম সংস্করণ ছাপাইয়া দিয়াছিলেন।

*

লোয়ার চিৎপুর রোডের ছয় নম্বর বাড়ি, বাড়িটা দোতলা; দোতলার একটি কক্ষ, কক্ষটি প্রশস্ত ও সুসজ্জিত—মেঝেতে কার্পেট পাতা; চারিদিকে দেওয়ালের গায়ে রাশি রাশি পুস্তক, কতক আলমারিতে সাজানো, কতক স্তূপাকার টেবিলের উপরে, কতক অবিন্যস্তভাবে কার্পেটের উপরে; কয়েকখানা আধখোলা; কয়েকখানা এমন ভাবে আছে, দেখিলেই মনে হয়, এখনই পঠিত হইতেছিল। দেওয়ালে খানকয়েক চিত্র, দেবতার নয়, প্রাকৃতিক নয়, মানুষের নয়, কয়েকজন বিখ্যাত কবির। মাঝখানে টেবিলে বই, কাগজ, কলম, পেন্সিল, ছুরি, মোমবাতিতে আলো ও বোতলে সুরা। দেওয়ালে একটা গোলাকার ঘড়ি, তাহার কাঁটা দুইটিতে মহাকালের পদধ্বনির প্রতিধ্বনি; রাত্রি এগারোটা; পথে শব্দ নাই, পথিক বিরল, এক-আধখানা ভাড়াটে গাড়ির চাকার শব্দ।

এক ব্যক্তি ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছেন—বয়স ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ, দোহারা চেহারা, মাথায় চেরা সিঁথি অঙ্গুলি-সঞ্চালনে এলোমেলো; পায়ে এক জোড়া দামী চটি; পরনে ঢিলা পায়জামা, গায়ে রেশমের হাতকাটা ফতুয়ার মত, বুকের বোতাম খোলা; ফাঁক দিয়া সুগঠিত রোমশ বক্ষঃস্থলের খানিকটা দৃষ্ট হয়; পরিপুষ্ট বাহু দুইটিও রোমশ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত পায়চারি করিতে করিতে কাব্য-রচনা করিতেছেন—'মেঘনাদবধ কাব্য'। ঘরের তিন কোণে তিন ব্যক্তি,—পরিচ্ছদ ও চেহারায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়, কাগজ কলম লইয়া উপবিষ্ট; একজনের কাছে বেশির মধ্যে কয়েকখানা অভিধান—অধিকাংশই সংস্কৃত; তিনি শব্দ সঙ্কলন করিয়া শোনান—আর দুইজন আবৃত্তি শুনিয়া লিখিয়া যান—টোলের পড়ুয়ার মত হলদে কাগজে, প্রাচীন পুঁথির আকারে। ঘরের চতুর্থ কোণে আর এক ব্যক্তি, পাষাণ-কঠিন, নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, নিশ্চল, চোখের পাতাটি পর্য্যন্ত পড়ে না; আশ্চর্য্য লোকটির ধৈর্য্য; মনে হয়, এমনই ভাবেই দুই শতাব্দী ধরিয়া বসিয়া আছেন—একটি আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তি—মিল্টনের।

মাইকেল পায়চারি করিতেছেন; বাহু পৃষ্ঠে বদ্ধ; মাঝে মাঝে দুই হাত সম্মুখে সজোরে ছুঁড়িয়া দিবার অভ্যাস আছে; মস্তিষ্ক যখন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তখন ঘন ঘন চুলের মধ্যে অঙ্গুলি-চালনা করিতে করিতে দ্রুত পায়চারি করেন। আবার কখনও বা মিল্টনের মূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া অপলকভাবে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা লেখা শেষ হইলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। ঘুম পায়, হাই তোলেন; চোখ রগড়াইতে থাকেন; গোপনে এক টিপ নস্য গ্রহণ করেন; হঠাৎ মাইকেলের দৃষ্টি মোমবাতির দিকে পড়ে, মোমটা ক্ষইয়া গিয়াছে; তাই তো, রাত্রি গভীর; মাইকেল চমকিয়া উঠিয়া হাসেন; স্থূল ওষ্ঠাধরের অবকাশে শুভ্র, উজ্জ্বল, সুগঠিত দন্তপংক্তি বিকশিত হয়। পিঠে গোটাকতক থাবড়া মারিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, কি পণ্ডিত, ঘুম পেয়েছে? নাও, একপাত্র টেনে নাও।

পণ্ডিত অপ্রস্তুতভাবে অন্য দুইজনের দিকে তাকান; মাইকেল তিনজনকে তিন পাত্র দেন এবং বলেন—**Touch not, taste not, smell not, drink not anything that intoxicates!**

পরক্ষণেই আবার পাত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শেক্সপীয়ার হইতে আবৃত্তি করেন—

Oh! Thou invisible spirit of wine,
If thou hast no name to be known by,
Let us call thee—Devil!

পণ্ডিতেরা পরস্পরের দিকে তাকাইয়া এক নিশ্বাসে পাত্র উজাড় করিয়া একটা অর্দ্ধোক্ত শব্দ করেন, তাহাতে অনুরোধ রক্ষার চেয়ে তৃপ্তির ভাবটাই অধিক ফুটিয়া উঠে। পণ্ডিতদের উঠিবার সময়ে মাইকেল জিজ্ঞাসা করেন, আজ কতদূর হ'ল?

একজন বলেন, "লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে।"

পণ্ডিতেরা বলিয়া যান, মোমবাতি আরও হ্রস্ব হইয়া আসে, মাইকেল উদ্‌ভ্রান্তের মত শব্দের ঝঙ্কারে মাতিয়া পায়চারি করিতে করিতে আবৃত্তি করেন—লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে। ঘরের মধ্যে একজন মাত্র শ্রোতা থাকে—মিল্টন; দুইজনে কি সংলাপ হয়, কেহ জানিতে পারে না।

* * *

'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা চলিতেছে; আগের মতই সব, কেবল কবির অনুপ্রেরণা আজ উদ্দীপ্ততর; দ্রুত পায়চারি করিতে করিতে কবিতা আবৃত্তি করিয়া যাইতেছেন, পণ্ডিতেরা লিখিয়া লইতেছেন, আজ আর পণ্ডিতদের অবসর নাই। যেদিন কল্পনা

এমন করিয়া কবির কাছে ধরা দেন না, সেদিন পণ্ডিতেরা বসিয়াই থাকেন, কবি বৃথা পায়চারি করিয়া মরেন। কবি বলিয়া যাইতেছেন—

"কুসুমশয়নে যথা সুবর্ণমন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজনধ্বনি সে সুখসদনে।
জাগিলা বীরকুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।"

এই পর্য্যন্ত প্রায় এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়া কবি থামিলেন; তারপরে কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ; পণ্ডিতেরা হাত গুটাইয়া উপবিষ্ট। একজন সাহসে ভর করিয়া কাসিলেন; মাইকেলের খেয়াল হইল; স্বপ্ন ভাঙিল; জিজ্ঞাসা করিলেন, কতদূর হয়েছে? পণ্ডিতেরা বলিলেন, "জাগিল বীরকুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।" অনুপ্রাসে মাতিয়া কবি ছত্রটি দুই তিন বার আবৃত্তি করিলেন; কিন্তু নূতন কিছুই বলিলেন না। পণ্ডিতেরা সাহস পাইয়া আবার কাসিলেন; মাইকেল কয়েক পা অগ্রসর হইয়া মিল্টনের মূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন; মিল্টনের দৃষ্টিহীন দৃষ্টির দিকে তাকাইয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন—

"Then with voice
Mild as when Zephyrus on Flora breathes,
Her hand oft touching, whispered thus awake,
My fairest, my espoused, my latest found.
Heaven's last best gift, my ever new delight;
Awake,"

তারপরে মিল্টনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পণ্ডিতদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া একটা চেয়ারের পিঠদান ধরিয়া সম্মুখে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে বলিয়া চলিলেন—

"প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্যকথা; কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) 'ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসি, তোমারে

পাখীকুল! মিল, প্রিয়ে, কমললোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তে! তুমি রবিচ্ছবি;
তেজোহীন আমি, তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম তুমি, হে, জগতে
আমার! নয়নতারা! মহার্ঘ রতন!
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম।'"

এতখানি বলিয়া পরিশ্রান্ত কবি চেয়ারটার উপরে বসিয়া পড়িলেন, পণ্ডিতেরাও হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন; একসঙ্গে দুইজনে লিখিতে থাকেন, পরে দুইজনের কপি মিলাইয়া পাঠ প্রস্তুত করা হয়; দ্রুত লিখিতে গিয়া অনেক সময় এক আধটি ছত্র বাদ পড়িয়া যায়।

ইতিমধ্যে 'মেঘনাদবধে'র কতক প্রকাশিত হইয়াছে। দেশময় তুমুল আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে। অনুরক্তরা বলিতেছে, কবি হিসাবে মধুসূদন কালিদাস, ভার্জিল, টাসো, মিল্টনের সমকক্ষ। মাইকেল কি আজ সেই কথাই ভাবিতেছেন? কালিদাস, ভার্জিল, টাসো বড় বটে, কিন্তু মিল্টন দেবতুল্য! মিল্টনের মত হওয়া অসম্ভব! মাইকেলের বিনয়গুণ একেবারে ছিল না বলা চলে না।

তাঁহার মনে পড়িল, জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মেঘনাদে'র প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষিত, রসিক, পণ্ডিত, সমাজের অগ্রণী এবং ধনী; তাঁহার এক পুত্র, যিনি 'মেঘদূতে'র অনুবাদ করিয়াছেন, তিনিও নাকি অমিত্রছন্দের পরম ভক্ত। লোকটা কবি ও ধনী। অনুবাদক আবার কবি! ধনীর ছেলে এই যা। কাজেই কবি। আঃ, আমার যদি—! ভবিতব্যতার কণ্ঠ হইতে অশ্রুতস্বরে ধ্বনিত হইল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক পুত্র কবি হইবে বটে, কিন্তু এখনও সে অজাত, এখনও সে আসন্ন ভবিষ্যতের গর্ভে।

তাঁহার মনে পড়িল বিদ্যাসাগরের কথা। বিদ্যাসাগর বলিয়াছেন, "তুমি খুব করিয়াছ। কিন্তু ভারতচন্দ্রকে ছাড়াইতে পারিয়াছ বলিয়া মনে হয় না।" আঃ,

কিছুতেই কৃষ্ণনগরের সেই লোকটার সঙ্গে আঁটিয়া উঠা যায় না। এখনও সকলে তাহাকে মাইকেলের চেয়ে বড় মনে করে। লোকটা বাংলা সাহিত্যের কি ক্ষতিই না করিয়াছে! তিনি মেঘনাদকে বিলাসের শয্যা হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে জাগ্রত করিয়াছেন; কিন্তু তাহার চেয়ে অনেক কঠিন সেই লোকটার বিলাসের ললিতছন্দ হইতে মুক্ত করিয়া বাংলা কাব্যকে জাগাইয়া তোলা। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ওই লোকটা।

কিন্তু তখনই আবার মনে পড়িয়া গেল চীনাবাজারের সেই সমালোচকের কথা। একটু হাসিও পাইল, আবার সান্ত্বনাও পাইলেন। লোকটা দোকানদার; সে নবপ্রকাশিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠ করিতেছিল; মাইকেল ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত, জিজ্ঞাসিত হইয়া লোকটা—সেই চীনাবাজারের দোকানদার বলিল, বাংলা দেশে এই ছন্দই সবচেয়ে বেশি চলবে। বাংলা সাহিত্যের অদৃষ্টে কি শেষে দোকানদারের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিবে! মনে পড়িল, কিছুদিন আগে রাজনারায়ণ বসুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি পণ্ডিতদের জন্য কাব্য-রচনা করিতেছি না; যাহারা ইউরোপীয় সাহিত্য ও আদর্শের সহিত কতক পরিচিত, তাহাদেরই জন্য আমার কাব্যসৃষ্টি।"

পুলিস-কোর্টের দ্বিভাষী মাইকেল সাহিত্যেরও দ্বিভাষী। যাহারা দুই ভাষা জানে না, তাহারা ইহার রস পাইবে না। এই দ্বিভাষিত্ব তাঁহার কবিপ্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে; ইংরেজী ভাষায় তিনি দেশীয় কাহিনী লিখিয়াছেন; বাংলা ভাষার কাব্যে উপাদান প্রায় সমস্তই বিদেশী। মাইকেল সরস্বতীর দরবারে স্বভাবসিদ্ধ দ্বিভাষী।

কে বলিবে, এইরূপ কত কথা তাঁহার মনে হইতেছিল? হয়তো তিনি ভাবিতেছিলেন, কাব্য, নাটক, রোমান্স, সমালোচনা সব দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যকে নাড়া দিতে হইবে; যশ তাঁহার চাই, সর্ব্বতোমুখী যশ; গ্রীক-কবিদের প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের ধমনীতে চালাইয়া দিতে হইবে। রাজনারায়ণ বসুকে 'মেঘনাদবধে'র প্রুফ দেখিবার পরে তিনি বলিয়াছেন—ইহাতে কি অমরতালাভ করা যাইবে না? সেই কথা মনে পড়িল।

কিংবা কে বলিবে, মাইকেল কবিখ্যাতিকে সত্যই অমূল্য মনে করিতেন কি না? বিলাত-যাত্রার সব আয়োজন প্রস্তুত; আশৈশবের স্বপ্ন সফল হইতে চলিল, তবু কত প্রভেদ! বিলাত-যাত্রা মহাকবি হইতে নয়, ব্যারিস্টার হইবার জন্য; সরস্বতীর মন্দির হইতে কখন্ অলক্ষিতে তাঁহার আসন লক্ষ্মীর মন্দিরে অপসৃত হইয়াছে। ব্যারিস্টার না হইয়া আসিলে আর মান থাকে না। কবিকে লোকে ভালবাসে, কিন্তু ধনী না হইলে, পদস্থ না হইলে সম্মান পাওয়া যায় না। আজ যাহারা কবি বলিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, অদূরভবিষ্যতে তাহারা বিস্মিতভাবে সম্ভ্রমের সহিত সম্মান করিবে কবি

মধুসূদনকে নয়, মাইকেল এম. এস. ডাট এস্কোয়ার অব দি ইনার টেম্পল, ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল-কে।

* * *

মধুসূদনের কাব্যের কালানুক্রমিক বিকাশ দেখাইবার চেষ্টা বৃথা। একটার পরে একটা লিখিত হইয়াছে, এ কথা বলার চেয়ে প্রায় সবগুলি কাব্য একসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, ইহাই বলা অধিকতর সত্য।

'তিলোত্তমা'র সঙ্গে 'ব্রজাঙ্গনা'র আরম্ভ। তারপরে 'মেঘনাদবধ' আর 'কৃষ্ণকুমারী' প্রায় একসঙ্গে লেখা চলিল। 'মেঘনাদবধ' শেষ না হইতেই 'বীরাঙ্গনা'। 'বীরাঙ্গনা'র পরে মধুসূদনের সাহিত্যিক দম হঠাৎ ফুরাইয়া আসিল; তিনি পাণ্ডব-বিজয়, সিংহল-বিজয়, ভারত-বৃত্তান্ত নামে তিনখানা কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সহসা কাব্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলেন, আর তিনি তেমন ভাবে মুখ তুলিয়া ভক্তের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল।

আর ওই বছরেই মে মাসে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে একটি শিশুর জন্ম হইল। পরবর্ত্তী কালে এই শিশুটির নামকরণ হইল—রবীন্দ্রনাথ।

অবজ্ঞাত প্রতিভার মত মর্ম্মান্তিক দৃশ্য কমই আছে। স্বভাবতই যে দশজনের মধ্যে বিশিষ্ট, সে দশজনের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, নিজের কথা কাহারও কর্ণগোচর করিতে পারিতেছে না, ইহার চেয়ে দুঃখের আর কি হইতে পারে?

বুভুক্ষু নেপোলিয়ান জীর্ণ সুতা-বাহির-হওয়া জামা গায়ে প্যারিসের পথে পথে ঘুরিতেছেন। কেহ তাঁহাকে জানে না, আত্মপ্রকাশে তিনি অক্ষম, আত্মহত্যা ও যশঃশিখরের দুই মেরুর মধ্যে তাহার চিত্ত দোদুল্যমান—এ দুঃখ কি পরবর্ত্তী জীবনের সেণ্ট হেলেনার নির্ব্বাসনের চেয়ে কম?

শেলীকে সকলে পাগল বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছে। বাপে-খেদানো, কলেজে-তাড়ানো, বন্ধুবান্ধবের দ্বারা উপেক্ষিত, পাওনাদারের দ্বারা লাঞ্ছিত যুবক কিছুতেই নিজের বিশিষ্টতা বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। মানসক্ষেত্রের সব ফসল ঘরে তুলিবার আগেই মৃত্যু আসিতে পারে—অনাদৃত কীট্‌সের এই ছিল ভীতি।

ইহাদের তুলনায় মাইকেলকে সৌভাগ্যবান্ বলিত হইবে। তাঁহার কলম ধরিবার আগে হইতেই বন্ধুবান্ধবের দল প্রস্তুত ছিলেন; কলম ধরিবামাত্র তাঁহারা প্রশংসার ঐক্যতান

শুরু করিলেন; এমন কি মাইকেল যদি কখনও বাংলা কাব্য না লিখিতেন, তবু এই সম্ভাবনার ভিত্তির উপরে বন্ধুরা তাহার অনর্জ্জিত যশের স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করিয়া দিতেন।

দেশব্যাপী নিন্দাও মস্ত একটা উত্তেজক ঔষধ—কবিকে তাহা যশঃপথে চালিত করে। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক নীরবতা। নিন্দা প্রশংসার বিকার মাত্র।

প্রথমে প্রথমে মধুসূদনকে নিন্দার গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই শিক্ষিত-সমাজের হাততালিতে নিন্দার কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল; এক জয়মাল্যের উপরে আর এক জয়মাল্য সংগ্রহ করিতে করিতে মধুসূদন বঙ্গসরস্বতীর মানসসরোবর হইতে বিলাতের জাহাজ-ঘাটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেকালের শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় মাইকেলের কাব্য ও প্রতিভা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; পরবর্ত্তী যুগের সমালোচকদের জন্য তাঁহাকে রসবোধের বাহির-দরজায় দাঁড় করাইয়া রাখেন নাই। তাঁহার নিতান্ত ব্যক্তিগত বন্ধুবান্ধবদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এমন বহু শিক্ষিত লোকের নাম করা যায় যাহারা সম্মিলিত কণ্ঠে মাইকেলের প্রতিভার জয়-ঘোষণা করিয়াছিলেন।

পাইকপাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র; যতীন্দ্রমোহন ও কালীপ্রসন্ন; জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ; রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী, দিগম্বর মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অপেক্ষাকৃত কমবয়সীদের মধ্যে দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু শেষে তিনিও মাইকেলের জয়ধ্বনিতে যোগ দিয়াছিলেন।

এই সময়ে জোড়াসাঁকোর কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বঙ্গভাষার অনুশীলনের জন্য 'বিদ্যোৎসাহিনী' নামে এক সভা স্থাপন করেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হইলে মধুসূদনকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য সভার একটি অধিবেশন হয়। বাংলা ভাষায় কাব্য লিখিয়া বাঙালী লেখকের ভাগ্যে সংবর্দ্ধনার ইহাই বোধ হয় প্রথম দৃষ্টান্ত।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধিবেশন; কলিকাতার গণ্য-মান্য শিক্ষিত-সম্প্রদায় নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত; মধুসূদন সভাস্থলে উপবিষ্ট; একুশ বছরের প্রতিভাদীপ্ত এক যুবক সভার পক্ষ হইতে মধুসূদনের উদ্দেশে নিম্নলিখিত মানপত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

"মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু।
কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর
সম্ভাষণ নিবেদনমিদং

যে প্রকারে হউক, বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্ত্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্ত্তা তাঁহার সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই। আপনি বাংলা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাংলা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাংলা ভাষার আদিকবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন; আপনি বাংলা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাংলা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাংলা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক, তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসিগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই, কিন্তু যখন তাহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম, হয়তো সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শনজনিত দুঃসহশোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময়ে বর্ত্তমান না থাকুন, বাংলা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে, ততদিন আমরা আপনার সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি, আপনি উত্তরোত্তর বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান্ হউন। আপনা কর্ত্তৃক যেন ভাবী বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজী ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাহারা কেবল আপনার গুণে

আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণ গ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা সভ্যবর্গাণাম্।"

মানপত্র পাঠ শেষ হইলে একটি মূল্যবান্ সুদৃশ্য পানপাত্র সভার পক্ষ হইতে মধুসূদনকে উপহার দেওয়া হইল।

মধুসূদনকে পানপাত্র উপহার! ইহা কি সমাদর, না, 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র লেখকের একটা সুনিপুণ শ্লেষ!

মানপত্র ও পানপাত্রের ব্যাপার শেষ হইলে মধুসূদন উত্তর দিতে উঠিলেন। তিনি বলিলেন—

"বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

স্বদেশের উপকার করা মানবজাতির প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে, এ দেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়। তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদর সম্মান প্রদান করেন সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা।

বিদ্যা বিষয়ে উৎসাহপ্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জলে যাদৃশ উর্ব্বরতরা হন, উৎসাহপ্রদানে বিদ্যাও তাদৃশ প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এ দেশের যে কতদূর উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।

আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা, যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সামাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি [সোমপ্রকাশ, ২০এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬১] *

বক্তৃতার সময় মধুসূদনের কি মনে হইতেছিল জানিবার উপায় নাই; কিন্তু 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র স্রষ্টার মনে কি এই দুই সভার মধ্যে একটা তুলনীয় ইঙ্গিত বিদ্যুতের মত খেলিয়া যায় নাই?

* * *

মাদ্রাজ হইতে ফিরিবার পরে আর বিলাত-যাত্রার আগে—এই সময়টাকে, এই কয়টি বৎসরকে মাইকেলের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বলা চলে।

* 'কালীপ্রসন্ন সিংহ'—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, প্রথম পুস্তক।

ইহার আগে ও পরে আর্থিক অভাব তিনি অত্যন্ত রূঢ়ভাবে অনুভব করিয়াছেন, এ সময়ে আর্থিক অভাব তেমন উগ্রভাবে দেখা দেয় নাই। চাকুরির নির্দ্দিষ্ট আয়, পুস্তকের আয় এবং অনেক সময়ে শ্রদ্ধার দান তাঁহার অভাব ঘুচাইতে সমর্থ হইয়াছিল। গৃহে শান্তি ছিল, গৃহের বাহিরে খ্যাতি ও সম্মান ছিল; বন্ধু-বান্ধবের প্রীতি ও সহায়তা তাঁহাকে পদে পদে রক্ষা করিয়াছে। আর কাব্যলোকে যে আত্মপ্রকাশের জন্য তিনি আবাল্য বৃথা প্রয়াস করিয়াছেন, এ সময়ে সেই স্বত-উৎসারিত কাব্যধনে তিনি ধন্য হইয়াছেন। এই সময়ে তাহার সমগ্র ব্যক্তিত্ব ও শক্তি একাগ্রতা লাভ করিয়া চরম অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল।

তবু কি এমন তাঁহার দুঃখ ছিল, যে জন্য মর্ম্মান্তিক এই কবিতাটি তিনি লিখিয়াছিলেন ?—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু ? হায় !
তাই ভাবি মনে !
জীবনপ্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে ধায়,
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ু হীন, হীনবল দিন দিন ;
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না, একি দায় !"

মধুসূদনের জীবনীকার বলিতেছেন—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতে বলিলে তিনি এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন।

কল্পনা করুন, মধুসূদন 'প্রভো,' 'পিতঃ' বলিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত লিখিতেছেন ! কিন্তু এই অনুরোধও এমন শোচনীয় নয়, যাহাতে এমন মর্ম্মভেদী কবিতা লিখিতে হইবে।

আসল কথা, প্রতিভার সঙ্গেই দুঃখ ও অতৃপ্তি জড়িত থাকে, বাহিরের সুখের দ্বারা তাহার বিচার চলে না; প্রতিভাবান্ লোক জগতে সুখী হইতে পারে না।

* * *

মধুসূদন নিজের কাব্য ও কাব্যশিল্প সম্বন্ধে অনেক চিঠি বন্ধুবান্ধবকে লিখিয়াছিলেন, সৌভাগ্যবশত, সেগুলি রক্ষিত হইয়াছে। এই সব চিঠিপত্র পড়িলে মধুসূদনের কাব্যজীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়; মধুর কাছে নিজের কাব্যজীবন অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। আবার কাব্য অপেক্ষা কাব্যসৃষ্টির প্রক্রিয়া তাঁহার কাছে কম সত্য ছিল না, আর অসাধারণ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের সঙ্গে সেই প্রক্রিয়াকে নিজের সম্মুখে আনিয়া তিনি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারিতেন; শিল্প-জীবনের ইতিহাস কবি নিজেই যেন লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

শর্ম্মিষ্ঠা হইতে বীরাঙ্গনা অবধি, প্রথম ছত্র বাংলা রচনা হইতে বাংলা দেশ পরিত্যাগ অবধি, যে সব ভাব, যে সব ইঙ্গিত তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে, সবই তিনি বন্ধুদের লিখিয়াছেন, তাঁহার চিঠিপত্র হইতে আমরা জানিতে পারি। আমাদের সৌভাগ্য যে, মধু নিজের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে শিশুসুলভ অহঙ্কারী ছিলেন, নতুবা এসব কথা জানিবার আর কি উপায় ছিল? বঙ্কিমের সাহিত্যজীবন ও সাহিত্যসঙ্কল্প সম্বন্ধে আমরা কি জানি? আর মধুসূদনের জীবনভাষ্যকার মধুসূদন স্বয়ং।

তাঁহার প্রথম বাংলা নাটক 'শর্ম্মিষ্ঠা' লিখিত হইলে বন্ধুদের অনুরোধে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব'-এর লেখক নাটুকে রামনারায়ণকে দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল; রামনারায়ণ এমন শিকার আগে আর পান নাই; শর্ম্মিষ্ঠাকে আগাগোড়া বদল করিবার মতলব আঁটিতেছিলেন; মধুসূদন সে সম্বন্ধে গৌরদাসকে লিখিতেছেন—

"রামনারায়ণ আমার নাটকের যে পাঠ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা আমাকে হতাশ করিয়াছে। তাহার সাহায্য আর আমি গ্রহণ করিব না স্থির করিয়াছি। হয় আমার নিজের শক্তিতে একাই দাঁড়াইব, নয় একাই পড়িব। আমার লেখাকে ঢালিয়া সাজিতে আমি রামনারায়ণকে বলি নাই; কেবল ব্যাকরণের ত্রুটি থাকিলেও সংশোধন করিতে বলিয়াছিলাম মাত্র। তুমি জান যে, স্টাইল লেখকের মনের প্রতিবিম্ব, এবং রামনারায়ণ ও আমার মধ্যে প্রভেদ অনেক। যাহা হউক, আমি তাহার কতক সংশোধন গ্রহণ করিব।...আমি জানি, আমার নাটকে বৈদেশিক ছায়া থাকা সম্ভবপর, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! যদি ব্যাকরণের দোষ না থাকে, যদি ভাবের উজ্জ্বলতা থাকে, যদি গল্প চিত্তরঞ্জক হয়, চরিত্র-সৃষ্টি সুসংবদ্ধ হয়, তবে বৈদেশিক ছায়াতে কাহার কি আসে যায়! মূরের কবিতাতে প্রাচ্যছায়া, বায়রনের কবিতায় এশিয়ার ছবি, কার্লাইলের রচনায় জার্ম্মানিকতা আছে বলিয়া কি তাহা তোমার ভাল লাগে না? আর মনে রাখিও আমার দেশবাসীদের মধ্যে যাঁহারা আমার ভাবে ভাবিত, প্রতীচ্য ভাবধারায় যাহাদের মন গঠিত, আমি লিখিতেছি তাহাদের জন্য; সংস্কৃত অলঙ্কার অনুসারে লিখিত হইলেই তাহা আদর্শ—এই দূষিত ধারণাকে আমি ছিন্ন করিব।

"আমার সাহসকে দুঃসাহস বলিয়া ভয় পাইও না। আমি এই নাটক এমন সব লোককে দেখাইয়াছি, যাহারা ইংরেজী জানে না, তাহাদের ইহা ভাল লাগিয়াছে। সাহিত্য-বিষয়ে, বন্ধু, আমি ধার করা পোশাকে পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থিত হইতে লজ্জাবোধ করি; আমি একটা নেকটাই বা কোর্ত্তা ধার করিতে পারি, কিন্তু আগাগোড়া পোশাক! কখনও নয়। দেখিও, এমন নাটক রচনা করিব যাহাতে এই দুষ্ট পণ্ডিতের দল বিস্মিত হইয়া যাইবে।"

পণ্ডিতের দল বিস্মিত হইয়াছিল এবং তাহার ইংরেজী-জানা বন্ধুদের বিস্ময়ও কম হয় নাই, তবে বিস্ময় একার্থক নয়।

পুনরায় 'শর্ম্মিষ্ঠা' সম্বন্ধে গৌরদাসকে—

"শর্ম্মিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি মাত্র দোষ সবাই দেখিতে পাইয়াছে—ইহার ভাষা দর্শকদের পক্ষে দুরূহ। কিন্তু ইহাকে আমি দোষ মনে করি না। দেশের সাহিত্যভাণ্ডারে স্থায়ী সম্পদরূপে ইহা যদি গণ্য হয়, তবে বিশ বছর পরে এ দোষে কেহ শর্ম্মিষ্ঠাকে দোষী মনে করিবে না। সত্য কথা বলিতে কি, প্রথম প্রয়াসেই এমন সাফল্যলাভ করিব আমি ভাবি নাই। শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে বাঙালী লেখকদের মধ্যে প্রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে।"

রাজনারায়ণ বসুকে তিনি লিখিতেছেন—

"তিলোত্তমা শীঘ্রই পুস্তক-আকারে প্রকাশিত হইবে।...আমার ভয় হইতেছে, আমার স্টাইলকে তুমি কঠিন মনে করিবে।...কিন্তু অনুপ্রেরণার স্রোতে ভাসিয়া শব্দগুলি অযাচিত-ভাবে আপনিই আসিয়া পড়ে। উৎকৃষ্ট অমিত্রাক্ষর ছন্দ স্বভাবতই ধ্বনিগম্ভীর এবং ইংরেজীর শ্রেষ্ঠ অমিত্রছন্দ-রচয়িতা মিল্টন দুরূহতম লেখক; ভার্জিল ও হোমারের কাব্যকেও সহজ বলা চলে না। সে কথা যাক। একজনের প্রথম কাব্যে অনেক দোষ-ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে হয়। খেলাচ্ছলে আমি এই কাব্য রচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, এমন কাব্য লিখিয়া বসিয়াছি যাহা আমাদের অতীত কাব্য-সাহিত্যকে উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়াছে; অন্তত ভবিষ্যৎ বাঙালী কবিদিগকে কৃষ্ণনগরের সেই লোকটার প্রবর্ত্তিত কাব্যধারা হইতে পৃথক ভাবে অনুপ্রাণিত কাব্য লিখিতে শিখাইবে। কৃষ্ণনগরের লোকটার উচ্চতর প্রতিভা থাকিলেও তাহার প্রবর্ত্তিত কাব্যধারা অত্যন্ত দূষিত।

"নাটক হিসাবে আমার প্রহসন দুইখানা যে তোমার ভাল লাগিয়াছে তাহাতে আমি সুখী। কিন্তু ও দুইখানা ছাপাইয়া এখন দুঃখ বোধ করিতেছি। তুমি জান যে আমাদের জাতির কোন প্রকৃত থিয়েটার নাই—অর্থাৎ ক্ল্যাসিকাল ছাঁদে রচিত নাটক যথেষ্ট নাই, যাহা আমাদের রুচিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে; এখন আমাদের প্রহসন রচনা করা উচিত নয়। তুমি আমার শর্ম্মিষ্ঠা দেখিয়াছ কি না জানি না। আমার আর একখানা নাটক [পদ্মাবতী] শীঘ্রই একদল শৌখিন অভিনেতা দ্বারা অভিনীত হইবে। যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে দেশের লোককে ক্ল্যাসিকাল ছাঁদে রচিত আরও তিন-চারখানা নাটক দান করিব, তারপরে ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বিষয় লইয়া পড়িব। তুমি জাতীয় মহাকাব্যের জন্য যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম, কিন্তু আমার মনে হয় না—কাব্যশিল্পের উপরে আমার এত অধিকার জন্মিয়াছে, যাহাতে ঐ বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে পারিব; এখনও কয়েক বছর অপেক্ষা করিতে হইবে। ইতিমধ্যে

আমার প্রিয় বীর ইন্দ্রজিতের মৃত্যুকে স্মরণীয় করিবার উদ্যোগ করিতেছি—ভয় পাইও না, পাঠককে আমি বীররসের দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিব না। ···রাশিয়ার রাজমুকুট ধারণ অপেক্ষা দেশের কাব্য-সাহিত্যের সংস্কারকে আমি অধিক গৌরবের মনে করি।

"আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কোন্ ইউরোপীয় ভদ্রলোক তোমাকে বলিয়াছিল যে, আমি বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করি। এক সময়ে তাহা সত্য ছিল। ·মেঘনাদবধের প্রথম কয়েক ছত্র তোমাকে পাঠাইলাম—কেমন লাগে জানিতে চাই। Ode-জাতীয় ছোট একখানি কাব্যগ্রন্থ যন্ত্রস্থ; ইহা আগাগোড়া রাধার বিরহ সম্বন্ধে।"

রাজনারায়ণ বসুকে—

"আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, বাংলা নাটক অমিত্রাক্ষরছন্দে লিখিত হওয়া উচিত, গদ্যে নয়; কিন্তু এ পরিবর্ত্তন ক্রমে ক্রমে করিতে হইবে। যদি আমি আর নাটক লিখি, তবে নিশ্চয় জানিও, সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের কথা মানিয়া কখনই চলিব না; ইউরোপের নাট্যরথীদের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব। পদ্মাবতী তোমার কেমন লাগিল জানাইও। ইহার প্রথম অর্দ্ধেকে গ্রীক স্বর্ণ-আপেলের কাহিনীকেই ভারতীয় পোশাক দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

"মেঘনাদ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। হয়তো এই বছরের শেষ নাগাদ ইহার রচনা সমাপ্ত হইবে। তোমার যে প্রথম কয়েক ছত্র ভাল লাগিয়াছে, সেজন্য আমি সুখী। সত্য কথা বলিতে কি, বন্ধু, আমি খ্রীষ্টান, হিন্দুধর্ম্মের জন্য তোয়াক্কা করি না, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের রচিত পৌরাণিক কাহিনীগুলি আমার এত ভাল লাগে! আগাগোড়া কবিত্বপূর্ণ! গল্প বলিবার রীতি জানা থাকিলে এই সব কাহিনী দিয়া কি না করা যায়!· তিলোত্তমা কাব্যখানা পাইলে এমন একটা সমালোচনা লিখিবে, যাহাতে দেশের লোকে সমালোচনা-বিজ্ঞান শিখিতে পারে।

"আমাদের দেশে বর্ত্তমানে সাহিত্যিক প্রচেষ্টার কত বড় ক্ষেত্র! হায় ভগবান, আমার যদি সময় থাকিত! কাব্য, নাটক, সমালোচনা, রোমান্স! গ্রীক ও রোমান বীরপুরুষগণের অপেক্ষা অধিক খ্যাতি একজন ইচ্ছা করিলে অর্জ্জন করিতে পারে।"

মধুসূদন বারংবার তাঁহার পত্রাবলীতে সময়ের অল্পতার জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন। সময়ের অল্পতা কেন? আসল কথা, ক্ষণস্থায়ী কাব্যজীবনকে মধুসূদন যেন চরম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আইন পড়িতেছিলেন, ইংলণ্ডে যাইবার ইচ্ছা তো গোড়া হইতেই ছিল; এবার দুইটায় মিলিয়া ব্যারিস্টারি পাসের সঙ্কল্প মনে দেখা দিতেছিল—তাই সময়ের জন্য আক্ষেপ।

রাজনারায়ণ বসুকে—

"এই কাব্যে [তিলোত্তমাসম্ভব] মানবরসের অভাব হয়তো লক্ষ্য করিয়াছ, কিন্তু মনে রাখিও, ইহা দেব-দৈত্যের কাব্য, ইহার মধ্যে মানুষকে আনিয়া ফেলা সম্ভব নয়। তোমার অবিশ্বাসী বন্ধুদের জন্য অমিত্রাক্ষরছন্দ সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা লিখিতে বসিয়াছি, কিন্তু ব্যাখ্যা করিবার অল্পই আছে। বস্তত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন আমাদের দেশে কেবল সময়সাপেক্ষ; তোমার বন্ধুরা যদি যথাস্থানে যতি রক্ষা করিয়া অমিত্রাক্ষর পড়িতে পারে, তবে দেখিবে, ইহা ছন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমার উপদেশ এই যে, বারংবার পাঠ কর; এই ছন্দে কানকে দীক্ষিত কর, তখন বুঝিবে, এ কি জিনিস! রঙ্গলাল রাজপুতদের কাহিনী অবলম্বন করিয়া আর একখানা কাব্য লিখিতেছে; বায়রন, মুর, স্কট তাহার কাছে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা; আমার ইচ্ছা করে যে, আরও অগ্রসর হইব। আমি বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, দান্তে, টাসো ও মিল্টন ছাড়া আর কিছু পড়ি না। কবিত্ব-প্রতিভাবান্ ব্যক্তিকে এই সব কবিকুলগুরুরা প্রথম শ্রেণীর কবিতে পরিণত করিতে পারেন।"

রাজনারায়ণ বসুকে পুনরায়—

"তোমার এই বন্ধুর মত কাব্যলক্ষ্মীর জন্য এমন পাগল আর কেউ আছে? দিবারাত্রি কবিত্বকলায় আমি বিলুপ্ত। আমি এই কাব্যখানাকে [মেঘনাদবধ] এই বছরের মধ্যে শেষ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি; 'হিরোইক স্টাইলে' কতখানি সাফল্যলাভ করিয়াছি, জানিতে চাই। বিশেষ আমার মত সাহিত্যিক বিপ্লবীর পক্ষে বন্ধুবান্ধবদের উৎসাহবাক্য একান্ত আবশ্যক। এতদিন যে সব লেখককে আমার দেশের লোক পূজা করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে ভণ্ড ও সম্মানের অযোগ্য বলিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছি। প্রত্যেক নূতন কাব্য লিখিবার সঙ্গে আমার শক্তির অভিনব বিকাশ প্রার্থনা করি। যদি মেঘনাদবধ কাব্য তুমি অযোগ্য মনে কর, আমি কিছুমাত্র দুঃখ না করিয়া তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলিব। তোমার বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি না। আমি শুনিয়াছি, তাঁহার এক পুত্র নাকি ভাল কবিতা লেখেন; আমার প্রিয় কাব্য মেঘদূতের তিনি অনুবাদ করিয়াছেন।

"আমি মেঘনাদের দ্বিতীয় সর্গ অর্দ্ধেক সমাপ্ত করিয়াছি; আমি যে আর দশজনের চেয়ে বেশি পরিশ্রমী তা নয়; কিন্তু যখন কবিতার ঝোঁক আসে, পাহাড়ের ঝরনার মত ছুটিয়া চলি।··· অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনটি ছোট কাব্য লিখিয়া তাহার পরে মিত্রাক্ষরে কিছু করিব; ভয় নাই, ত্রিপদী ও পয়ার নয়; ইটালীর অষ্টপদী ছন্দে একটা রোমান্টিক কাহিনী লিখিব।

"এই অবান্তর পত্রের জন্য ক্ষমা করিও, কিন্তু রাবণের বিজয়ী পুত্রকে তোমার কেমন লাগিল? সে একটা লোক ছিল বটে, বিভীষণ না থাকিলে সে বানরসেনাকে

সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিত। কবিবর যদি রামের সঙ্গে কতকগুলি মানুষ অনুচর দিতেন, তবে আমি মেঘনাদের মৃত্যুর বিষয়ে রীতিমত একখানা ইলিয়াড লিখিয়া ফেলিতাম।"

'তিলোত্তমাসম্ভব' সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসুকে—

"ইন্দ্রের প্রতি তুমি অবিচার করিতেছ; সে বীরপুরুষ, কিন্তু অদৃষ্টের বিরুদ্ধে কি করিবে? সুন্দ-উপসুন্দের প্রতি সহানুভূতিতে তুমি ইন্দ্রকে বুঝিতে পার নাই; আমিও উহাদের ভালবাসি এবং ইচ্ছা ছিল, আরও একটা সর্গ বাড়াইয়া দিয়া উহাদের মূর্ত্তি উজ্জ্বলতর করিয়া তুলি। আদিরসের বাহুল্যের কথা লিখিয়াছ, তাহা বোধ করি, কালিদাসের প্রভাবে।

"মেঘনাদবধের প্রথম সর্গ শেষ করিয়াছি। আমার ইচ্ছা ছিল, গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর সৌন্দর্য্য আমাদের কাহিনীর সঙ্গে মিশাইয়া দিই, এই কাব্যে আমি কল্পনাকে অবাধে বিহার করিতে দিব, এবং বাল্মীকি হইতে যত কম সম্ভব গ্রহণ করিব। ভয় নাই, কাব্যকে অহিন্দু বলিয়া অভিযোগ করিবার কারণ ঘটিবে না, একজন গ্রীক যে ভাবে লিখিত, সেই ভাবে লিখিব, অন্তত লিখিতে চেষ্টা করিব।"

"প্রিয় রাজনারায়ণ, মেঘনাদ তোমার ভাল লাগিয়াছে জানিয়া কি সুখীই না হইয়াছি! নয় সর্গে ইহা শেষ করিবার ইচ্ছা। দ্বিতীয় সর্গ শেষ করিয়া ফেলিয়াছি—আশা করি, এই সর্গ তোমাকে মুগ্ধ করিবে। 'বরুণানীকে' আমি এক অক্ষর কমাইয়া 'বারুণী' করিয়া ফেলিয়াছি; ইহা 'বরুণানী'র অপেক্ষা অনেক বেশি সঙ্গীতে পূর্ণ। সংস্কৃত ব্যাকরণ লইয়া কেন যে মাথা ঘামাইব, বুঝিতে পারি না। বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তক বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি স্থাপনের জন্য আমি মাহিনার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত দান করিতে প্রস্তুত।"

"প্রিয় রাজ, এবারে আমি রীতিমত একখানা ট্র্যাজেডি লিখিতেছি—গদ্যে। গল্পটা টডের রাজস্থান হইতে গৃহীত। তুমি বোধ হয় হতভাগ্য কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী অবগত আছ; আর একটা অঙ্ক লিখিলেই হয়—পঞ্চমাঙ্ক। মেঘনাদবধের হাতে-লেখা যে কপি পাঠাইলাম, তাহা বর্ণাশুদ্ধিতে পূর্ণ; কিন্তু কিছুদিন আগেও তো আমরা 'শিব' বানান 'যীব' করিয়া লিখিলে বিস্মিত হইতাম না। আমাদের মাতৃভাষা কি দ্রুত উন্নত হইতেছে, বহুযুগের নিদ্রা কেমন অনায়াসে ভাঙিতেছে!

"মেঘনাদের দ্বিতীয় সর্গ পড়িয়া তোমার ইলিয়াডের চতুর্দ্দশ সর্গের কথা মনে পড়িবে; আইডা পর্ব্বতে জুপিটারের কাছে জুনোর অভিসার-দৃশ্যকে আমি জানিয়া শুনিয়া ধার করিয়াছি—তবে তাহাকে যতদূর সম্ভব হিন্দু পোশাক দিতে চেষ্টা করিয়াছি। …ইহার অমিত্রাক্ষরে অনেক পরিমাণে ভার্জ্জিলের মাধুর্য্য আনিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

"তিলোত্তমা বেশ বিক্রয় হইতেছে। অমিত্রাক্ষর এক্ষণে চালু হইয়া গিয়াছে। ভারতের মানচিত্র দেখিয়া রণজিৎ সিংহ বলিয়াছিল—'সব লাল হো যায় গা', আমি বলিতেছি—"সব অমিত্রাক্ষর হো যায় গা।"

পুনরায় রাজনারায়ণ বসুকে—

"আমি কৃষ্ণকুমারী ট্র্যাজেডি শেষ করিয়াছি।...মেঘনাদের তৃতীয় সর্গ ধরিয়াছি, যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে ইহা দশ সর্গে শেষ করিয়া রীতিমত একটা এপিক গড়িয়া তুলিব। বিষয়টি সত্য সত্যই এপিকোচিত, কিন্তু বানরগুলা বিপদে ফেলিয়াছে। সবটা শেষ করিবার আগে প্রথম পাঁচ সর্গ ছাপিব; দিগম্বর মিত্র মহাশয় গ্রন্থ ছাপিবার খরচ দিবেন. এ বিষয়ে আমি খুব সৌভাগ্যবান্; যাহা লিখি তাহারই পৃষ্ঠপোষক ও ক্রেতা জুটিয়া যায়। বঙ্গসাহিত্যে আমি সনেটের প্রবর্ত্তন করিতে চাই; কয়েকদিন আগে নিম্নলিখিত সনেটটি লিখিয়াছি—

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি'
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।

"কি বল? আমার মনে হয়, প্রতিভাবান্ কবিরা সনেট লিখিতে আরম্ভ করিলে কালক্রমে ইটালীয় সনেটের সঙ্গে আমরা প্রতিযোগিতা করিতে পারিব; বিদ্যাসাগর মহাশয় অবশেষে আমার কাব্যে প্রতিভার লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন।"

আর একখানি চিঠিতে মেঘনাদ সম্বন্ধে—

"আমি ৭৫০ ছত্রে ষষ্ঠ সর্গ শেষ করিয়াছি। এই কাব্য খুব লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে; কেহ কেহ বলিতেছে, ইহা মিল্টনের অপেক্ষাও ভাল; কিন্তু তাহা সম্ভব নয়, মিল্টনের অপেক্ষা ভাল হওয়া অসম্ভব; কাহারও কাহারও মতে ইহা কালিদাসকে পরাজিত করিয়াছে. ইহাতে আমার আপত্তি নাই; আমার মনে হয় ভার্জিল, কালিদাস ও টাসোর সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব নয়; যদিও মহাকবি, তবুও তাহারা মানুষ বই নয়— মিল্টন দেবতা!

"শুনিয়া সুখী হইবে যে, কিছুদিন আগে বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও তাহার সভাপতি কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় আমাকে চমৎকার একটি রূপার পানপাত্র উপহার দিয়াছেন। বিরাট একটি সভা হইয়াছিল, বাংলা ভাষায় মানপত্র দান করা হইয়াছিল; খুব সম্ভব

তুমি সেই মানপত্র ও বাংলায় তাহার উত্তর পড়িয়াছ। কল্পনা কর যে, আমাকে বাংলায় উত্তর দিতে হইয়াছিল!

"বইখানা [মেঘনাদ] বেশ কাটিতেছে। তোমার বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন যে, অন্য কোন হিন্দু গ্রন্থকার ইহার কাছে দাড়াইতে পারে না; ইহার কল্পনা দূরতম প্রসারী।"

"মেঘনাদের নবম সর্গের কয়েক ছত্র লিখিতে এখনও বাকি আছে।···মেঘনাদের দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রথমার্দ্ধের অপেক্ষা তোমার ভাল লাগিবে। আমার ধারণা ছিল না যে, আমাদের মাতৃভাষা—এত বিপুল ঐশ্বর্য্য লেখকের সম্মুখে ধরিয়া দিবে, আর আমি তো পণ্ডিত নই, জানই। কল্পনা ও চিন্তার স্রোতে শব্দ আপনিই ভাসিয়া আসে, সে সব শব্দ আমি কখনও ভাবি নাই। দেখ, কি রহস্য!···আমি কাব্যখানা নিখুঁতভাবে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি, এবং কোন ফরাসী সমালোচকও ইহাতে ভুল ধরিতে পারিবে না। বোধ হয়, চতুর্থ সর্গের সীতাহরণের বৃত্তান্ত ইহাতে না দিলেও চলিত; কিন্তু ইহা কি বাদ দেওয়া যায়! অনেকের মতে প্রথম পঞ্চ সর্গের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ; যদিও যতীন্দ্র ও তাঁহার দল তৃতীয় সর্গকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। আমার মুদ্রাকর (তিনি ভারতচন্দ্রের ভক্ত) প্রথম সর্গকে সে স্থান দিতে চাহেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের শত্রুদের ইহা পরাজিত করিয়াছে।

"আমাকে ইতিমধ্যেই লোকে কালিদাস ও মিল্টন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে; আমি জানি না ইহা কতদূর সত্য! যদি আরও কিছুদিন বাচিয়া থাকি এবং কাব্য-চর্চা করি, তবে আরও উন্নতি করিব, সন্দেহ নাই; তিলোত্তমা ও মেঘনাদের অমিত্রাক্ষরে কত প্রভেদ পড়িয়া দেখ।

"ঈশ্বরচন্দ্রের [পাইকপাড়ার রাজা] মৃত্যুতে বাংলা নাট্যমঞ্চের ক্ষতি হইল; কিন্তু এ যুগ নাটকের যুগ নয়; লোকের কান আগে অমিত্রাক্ষরছন্দে অভ্যস্ত হওয়া দরকার। কৃষ্ণকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতীকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

"কালিদাস, ভার্জিল ও টাসোর কথা মনে কর। আমার মনে হয় না, ইংলণ্ডে ইহাদের সমকক্ষ কোন কবি আছে। মিল্টন অন্য স্তরের ব্যক্তি। তদ্‌রচিত শয়তানের মত উচ্চতম কল্পনায় ও ভাবনায় তিনি পরিপূর্ণ; কিন্তু ভালবাসার ভাব তাঁহার মধ্যে নাই, মিল্টনের ভাব পাঠকের মনকে উচ্চতম স্তরে উন্নীত করিতে পারে, হৃদয়কে স্পর্শ করে না। ফলে কি হইয়াছে? তাঁহার খ্যাতি অসীম, কিন্তু পাঠক কয়টি? মিল্টনই শয়তান; তিনি আমাদের অপেক্ষা উন্নততর জীব, কিন্তু তাঁহার জন্য আমরা সমবেদনা অনুভব করি না; বিস্ময়ে ও ত্রাসে তাহার জলদগর্জ্জন কানে প্রবেশ করে; নির্জ্জন বনে সিংহের গভীর গর্জ্জনের মত তাঁহার কণ্ঠস্বর।"

রাজনারায়ণ বসুকে—

"এক বছরের মধ্যে—সে বছরও পূরা গত হয় নাই, একখানা ট্র্যাজেডি, একটা গীতি-কাব্য, আর আস্ত মহাকাব্যের অর্দ্ধেক! আর যদি কোন কারণে আমাকে প্রশংসা না কর, অন্তত পরিশ্রমী বলিয়া করিতেই হইবে। দাড়াও, আমি গদ্য লিখিয়া, যে সব ভদ্রলোক বড় লেখক বলিয়া গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দিতেছি। বড় লেখক! মাথা আর মুণ্ড! তুমি নিশ্চয় জানিও বন্ধু, আমি আকস্মিক ধূমকেতুর মত আকাশে উদিত হইব—তাহাতে কোন ভুল নাই।

"এইমাত্র মহরমের গোলমাল শেষ হইয়া গেল। ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে যদি কোন মহাকবির উদয় হয়—তবে তিনি হাসান হোসেন ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া একখানা সত্যকার কাব্য লিখিতে পারেন—সমস্ত জাতির অনুভূতিকে তিনি কাব্যে রূপ দিতে পারেন। আমাদের হাতে সেরূপ কোন গল্প নাই। এখানে লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, মেঘনাদবধের কবির সমবেদনা রাক্ষসগুলার দিকে। ইহা সত্য। রাম ও তাহার অনুচরদের আমি ঘৃণা করি, কিন্তু রাবণের আইডিয়া আমার কল্পনাকে উদ্দীপিত করিয়া তোলে; লোকটা সত্যই বিরাট ছিল।"

মেঘনাদবধ শেষ করিয়া কবি কোন্ বিষয়ে লিখিবেন চিন্তা করিতেছেন, বন্ধুরা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহাকে লিখিতে পরামর্শ দিতেছেন; এ বিষয়ে রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন লিখিতেছেন—

"যতীন্দ্র কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ লইয়া লিখিতে বলিতেছেন; আর এক বন্ধু বলিতেছেন, ঊষা-হরণ সম্বন্ধে লিখিতে; আমার কিন্তু ইচ্ছা, তোমার পরামর্শমত সিংহল-বিজয় সম্বন্ধে লিখি।

"মেঘনাদবধের চেয়ে ভাল কিছু লেখা সহজ নয়—তবু চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি? কি বল? না, এখন হইতে কেবল ছোট ছোট গীতি-কবিতা ও সনেট লিখিয়া জীবন অতিবাহিত করিব। না, ইহা নিতান্ত অসহ্য। আমাকে সিংহল-বিজয়ের গল্পটা আবার পাঠাইও। যে কাহিনীতে সমুদ্র ও পর্ব্বত আছে, আর আছে সমুদ্রযাত্রা, যুদ্ধ আর প্রেমের জন্য নানা রকম দুঃসাহসিকতা—এমন গল্প আমি ভালবাসি—কল্পনা অবাধ-বিহারের সুযোগ পায়।

"আমি বীরাঙ্গনা নামে একখানা কাব্য আরম্ভ করিয়াছি—ইহাতে পৌরাণিক রমণীরা স্বামী বা প্রণয়ীর কাছে পত্রাকারে মনোবেদনা জানাইতেছে। ইহা Heroic epistle বা পত্র-কাব্য। সবসুদ্ধ একুশখানা পত্র-কাব্য থাকিবে; এগারোখানা ইতিমধ্যেই শেষ করিয়াছি।

"কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমার কাব্যজীবন শেষ হইয়া আসিল; আমি ইংলণ্ডে

ব্যারিস্টারি পড়িতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি; সুতরাং এবার কাব্যলক্ষ্মীর কাছে বিদায় লইতে হইবে।

"শুনিয়া সুখী হইবে যে, গ্রেট বিদ্যাসাগর এতদিনে নূতন কবিতার অনুরাগী হইয়াছেন—এবং কাব্যশিল্পের প্রবর্তনকারীকে সম্মান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নূতন কাব্যের সঙ্গীতে এখনও তাহার কান অভ্যস্ত হয় নাই, কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।"

* * *

পরবর্তী চিঠি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত। ইনি বেলগাছিয়ার নাট্যশালায় কখনও কখনও অভিনয় করিতেন, মধুসূদন তাহার নট-প্রতিভার অনুরাগী ছিলেন; ইহাকে গ্যারিক বলিয়া মাঝে সম্বোধন করিতেন। নিজের নাটকগুলি সম্বন্ধে এবং নাটকের সঙ্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দের কি সম্বন্ধ, সে বিষয়ে মধুসূদন তাহাকে প্রায়ই চিঠিপত্র লিখিতেন। বলা বাহুল্য, এই সব চিঠিরও প্রধান উদ্দেশ্য, কোন একজন রসিক ব্যক্তির কাছে, কোন একটা উপলক্ষ্যে আত্ম-বিশ্লেষণ।

"কি ভাবে আমি অগ্রসর হইতেছি, সে বিষয়ে দুই চারিটা কথা বলি। বলা বাহুল্য যে, সব ভাষাতেই কাব্যের পক্ষে অমিত্রাক্ষর যোগ্যতম ছন্দ; কুকবির পক্ষে যেমন মিত্রাক্ষর, সত্যকার কবির পক্ষে তেমনই অমিত্রাক্ষর; শক্তিশালী মন বন্ধনে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সে বন্ধন যে রকমই হউক না কেন। চীন দেশে মেয়েদের পা লোহার জুতায় আবদ্ধ করা হয়। তাহার পরিণাম কি? খঞ্জত্ব।

"আমার কবিতা পড়িবার সময়ে এই কয়েকটি বিষয়ে নজর রাখিবে—প্রথম, উপমা; দ্বিতীয়, যে ভাষায় সে উপমা ও ভাব প্রকাশিত; তৃতীয়, প্রত্যেক শ্লোকের গতি; সবটা মিলিয়া কি রকম হইল, সে দিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নাই; সময়ে তাহা লোকে বুঝিতে পারিবে। যদি উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে সার্থকতা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আর বন্ধুদের দুশ্চিন্তার কারণ নাই। আজ, না হয় কাল, না হয় ত্রিশ বৎসর পরে আমার কাব্যের খ্যাতি হইবেই।

"যখন আমি প্রথমে বাংলায় লিখিতে আরম্ভ করি, আমার কান বিদ্রোহ করিয়া উঠিত, এখন বাংলা ভাষার সঙ্গে আমার আপোস হইয়া গিয়াছে। অমিত্রাক্ষরের মাধুর্য্য ও শক্তিতে আমি বিস্মিত। নাটকের অমিত্রাক্ষরের আবৃত্তি যদি যথাযথ হয়, তবে ইংরেজী অমিত্রাক্ষর যেমন ইংরেজী গদ্যের মত শোনায়, বাংলাও তেমনই শোনাইবে: অবশ্য গদ্যের স্বাধীনতার সঙ্গে কাব্যের মাধুর্য্যের ছাপ জড়াইয়া থাকিবে। আমি ইহাতে যমক ও অনুপ্রাস—যতটা পছন্দ করি, তাহার বেশি ব্যবহার করিয়াছি; সেটা কেবল অমিত্রাক্ষরে অনভ্যস্ত কানকে

তুলাইবার জন্য। নিশ্চয় জানিও, বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিবে, এবং আমরা বর্ত্তমানে ইউরোপীয়দের মত, আমাদের ক্ল্যাসিক্যাল লেখকদের অতিক্রম করিতে না পারিলেও, অন্তত তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারিব। আমাদের মধ্যে যদি সে রকম প্রতিভাবান্ ব্যক্তি না থাকে, তবে অন্তত ভবিষ্যতের জন্য আমরা পথিকৃৎ হইতে পারি। এস, আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাক। ললিত-লবঙ্গ-লতা-ওয়ালার দল, ভারতচন্দ্রের (আমাদের পোপ) অনুকরণকারীর দল, আমাদের চেষ্টায় বিরক্ত হইতে পারে, কিংবা হাসিতে পারে। কিন্তু আমি বলি, তারা চুলায় যাক।"

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' স্ত্রীচরিত্র সৃষ্টিতে কবি কি বাধা অনুভব করিতেছিলেন, সে সম্বন্ধে কেশববাবুকে—

"ইউরোপে স্ত্রীলোকের স্থান, কি নাটকে, কি সমাজে আমাদের দেশের অপেক্ষা অন্য রকমের। যদি কোন পতিব্রতা নারীকে তাহার স্বামী ছাড়া আর কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতেছে দেখাই, তবে আমাদের দর্শকরা শিহরিয়া উঠিবে। এ হইতেছে এমন একটা গণ্ডি, যাহার বাহিরে আমার যাইবার উপায় নাই। সুতরাং নাটককে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবার জন্য বেশি-সংখ্যক স্ত্রীচরিত্র আমদানি করিয়া তুলিতে হয়। ইউরোপীয়ান অপেক্ষা আমরা, এশিয়াবাসীরা, বেশি রোমান্টিক। শেক্সপীয়রের নাটকের দিকে তাকাও; মিড-সামার নাইট্‌স ড্রীম, রোমিও জুলিয়েট বা ওই রকম দুই চারখানা ছাড়া আর কোন্ নাটকটি সত্য রোমান্টিক—যে ভাবে শকুন্তলা রোমান্টিক? ইউরোপীয় নাটকে জীবনের বাস্তবতা, প্রবৃত্তির দুদ্দমতা, ভাবাতিশয্যের মহত্ত্ব আছে। কিন্তু আমাদের নাটকে সবই কেবল কোমল, সবই কেবল রোমান্টিক। আমরা বাস্তবকে ভুলিয়া পরীর রাজ্যের স্বপ্নে বিভোর। এদেশে নাটকের প্রাথমিক উন্নতিও হয় নাই; আমাদের নাটক কেবল নাট্য-কাব্য। শর্ম্মিষ্ঠাতে আমি অনেক সময়ে নাট্যকারের কলম ছাড়িয়া কবির কলম ধরিয়াছি; অনেক সময় বাস্তবকে ভুলিয়া কবি-সুলভ হইয়া উঠিয়াছি। বর্ত্তমান নাটকে আমি নিজের উপরে কতক দৃষ্টি রাখিব, কাব্যের জন্য ইতস্তত দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিব না, তবে যদি সম্মুখে তাহাকে দেখি, অবশ্য ত্যাগও করিব না; এবং নিশ্চয় জানি, মাঝে মাঝে তাহার সঙ্গে দেখা হইবে। এবারে এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করিব, যাহারা কবির মুখপাত্র হইয়া নিজেদের স্বকীয়ত্ব লাভ করিবে।

"আমার ভাষা যে তোমার পছন্দ হইয়াছে, সে জন্য আমি আনন্দিত; অভ্যাসের দ্বারাই কেবল স্বচ্ছন্দতা লাভ করা যায়—এখনও আমি শিক্ষানবিশ মাত্র; কিন্তু আমি প্রগতিবান্ জীব। নাটকখানা ট্র্যাজেডি বলিয়াই কোন দৃশ্যকে কমিক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করি নাই; আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বলিতে পারি, সে রকম করিলে নাটকের মূল

ভাবের সঙ্গে অসঙ্গতি ঘটিত; কিন্তু কথোপকথনের মধ্যে যেখানে রসিকতা আপনি আসিয়া পড়িয়াছে, ছাড়ি নাই; আমার আদর্শ হইতেছে, ট্র্যাজেডির জোর করিয়া কমিক হইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু গৌণ দৃশ্যগুলিতে যদি হাস্যরস স্বতই আসিয়া পড়ে, তাহা ছাড়িবার কারণ নাই। আমার বিশ্বাস, শেক্সপীয়রেরও ইহাই ছিল আদর্শ।

"আমি কুড়ের মত বসিয়া আছি, ভাবিও না; দুই দিন আগে কৃষ্ণকুমারী শেষ করিয়াছি; ৬ই আগস্ট আরম্ভ—৭ই সেপ্টেম্বরে শেষ; খুব দ্রুত, কি বল?

"তুমি ইহার পঞ্চম অঙ্ক বিশেষ পছন্দ করিবে ভাবিয়া খুশি হইয়া উঠিতেছি যেখানে হতভাগ্য কৃষ্ণকুমারী বুকে ছোরা মারিয়া শয্যার উপরে পড়িয়া গেল, সেখানে আমি অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারি নাই।"

রাজনারায়ণ বসুকে—

"আমার নূতন কাব্যখানা [বীরাঙ্গনা] বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করিয়াছি। অসাধারণ লোক! নানা দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের দেশের মধ্যে তিনি এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। যদিও তিনি এখনও নবপ্রবর্ত্তিত কাব্য উত্তমরূপে আবৃত্তি করিতে পারেন না—তবু সে সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুব উচ্চ। তাঁহার প্রশংসাকে সত্য বলিয়া লইতে পারি—কারণ তিনি তো খোসামোদ করিবার লোক নন।"

* * *

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন লোয়ার চিৎপুর রোডের বাসা ছাড়িয়া খিদিরপুরের ৬নং জেম্‌স লেনের বাসায় উঠিয়া আসিলেন। মাদ্রাজ হইতে তিনি একাকী আসিয়াছিলেন, পরে পুলিস-কোর্টে দোভাষীর কাজ করিবার সময়ে পত্নী হেনরিয়েটাকে কলিকাতায় আনাইয়া লইয়াছিলেন।

মধুসূদন ও হেন্‌রিয়েটার পুত্র-কন্যাদের কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রথম কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম—তখন শর্ম্মিষ্ঠা নাটক লেখা শেষ হইয়াছে। কন্যার নামে কবির সেই নাটকের স্মৃতি; দ্বিতীয় সন্তানের নাম ফ্রেডারিক মিল্টন দত্ত, বাংলা নাম মেঘনাদ; ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মেঘনাদবধ রচনা; পুত্রের নামের মধ্যে একাধারে সেই কাব্যের ও মধুসূদনের মতে জগতের শ্রেষ্ঠ কবি মিল্টনের নাম জড়িত। কনিষ্ঠ পুত্র অ্যাল্‌বার্ট নেপোলিয়ান দত্তের নামে ফরাসী দেশের ও ফরাসী সম্রাটের স্মৃতি—যে সম্রাট-দম্পতীকে একদা প্যারিসের রাজপথে 'জীবতু সম্রাট্' বলিয়া তিনি স্কুলের বালকের ন্যায় অভিবাদন করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের পুত্র-কন্যারা কেহই দীর্ঘজীবী হন নাই; নেপোলিয়ান দত্ত ছাড়া আর দুইজনের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়।

নেপোলিয়ান দত্ত অহিফেন-বিভাগে চাকুরি করিতেন; প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। আর শর্ম্মিষ্ঠার দ্বিতীয় বিবাহের এক পুত্র দার্জ্জিলিং জেলায় আবগারি বিভাগে বহুকাল চাকুরি করিয়াছিলেন। মধুসূদনের জীবিত বংশধরেরা দুইজনেই আবগারি বিভাগে কাজ করিতেন।

তাঁহার জীবনীকার লিখিতেছেন—

"অ্যাল্‌বার্ট দত্তকে মাইকেল মধুসূদনের একমাত্র পুত্র জানিয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাকে অহিফেন-বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।"

আবার শর্ম্মিষ্ঠার দ্বিতীয় বিবাহের পুত্র সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

"মধুসূদনের দৌহিত্র জানিয়া বেঙ্গল গবর্মেণ্টের প্রধান সেক্রেটারি বোল্টন সাহেব তাঁহাকে রাজকর্ম্মে (**Superintendent of Excise and Salt, Darjeeling**) নিযুক্ত করেন।"

বিশেষ করিয়া এই আবগারি-বিভাগে নিয়োগ কি গবর্মেণ্টের সহৃদয়তা, না মাইকেলের কাব্য ও জীবনের একপ্রকার সমালোচনা? তবে কি গবর্মেণ্টেরও রসজ্ঞান আছে বলিতে হইবে?

অবশেষে মধুসূদন খিদিরপুরে পৈতৃক বসতবাড়ি বাল্যবন্ধু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিক্রয় করিয়া ও জমিদারি মহাদেব চট্টোপাধ্যায় নামে পুরাতন এক কর্ম্মচারীকে পত্তনি দিয়া বিলাত যাইবার ব্যবস্থা পাকা করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার জীবনীকার লিখিতেছেন—

"এইরূপ স্থির হইল যে, মহাদেব মধুসূদনকে তাঁহার ইংলণ্ড গমনের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কিয়ৎ পরিমাণ অর্থ অগ্রিম দিবেন, এবং তাঁহার পত্নী-পুত্রাদির ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ মাসিক দেড় শত করিয়া টাকা দিবেন। মহাদেব যাহাতে নিয়মিতরূপে কার্য্য করেন, পরলোকগত রাজা দিগম্বর মিত্র তাঁহার প্রতিভূস্বরূপ হইয়াছিলেন।"

বিলাত-যাত্রার মাসখানেক পূর্ব্বে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখিতেছেন—

"এখন আর কবি মধুসূদন নয়। এবার মাইকেল এম. এস. ডাট্ এস্কোয়ার, ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল অব দি ইনার টেম্পল। চমৎকার শোনাইতেছে। আশা করি আমি অকৃতকার্য্য হইব না।

খুব সম্ভব আগামী মাসে আমি ইংলণ্ড-যাত্রা করিব। যদি ফিরিয়া আসি, দেখা হইবে—আর যদি না আসি, আজ হইতে এক শত বৎসর পরে আমার দেশবাসীরা কি বলিবে?—

Far away, far away,
From the land he lov'd so well,
Sleeps beneath the colder ray."

পুনরায়, যাত্রার কয়েকদিন আগে --

বুধবার, ৪ঠা জুন, ১৮৬২

"প্রিয় রাজনারায়ণ,

শুনিয়া সুখী হইবে আমি বিলাত-যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়াছি, এখন ভগবান ইচ্ছা করিলে ৯ই সকালে ক্যাণ্ডিয়া জাহাজে যাত্রা করিব, আশা করিতেছি। তুমি ভাবিও না যে, আমি কাব্যলক্ষ্মীকে ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছি, যদি নবপ্রবর্ত্তিত কাব্যের সমাদর না হইত, তবে নিশ্চয় আমি দেশে থাকিতাম, কিন্তু অতি সহজে আমাদের জয় হইয়াছে; এখন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক কবিদের উপরে ভার ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে— যদিও আমি দূর হইতে এই আন্দোলনকে সাহায্য করিতে থাকিব।

মেঘনাদবধের সটীক দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতেছে, এবং সত্যকার একজন বি. এ. তাহার সমালোচনামূলক ভূমিকা লিখিতেছে; তোমার মতকেই সে সমর্থন করিয়াছে; বাংলা ভাষার ইহা শ্রেষ্ঠ কাব্য। এক বছরে হাজার কপি মেঘনাদবধ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

রাজনারায়ণ, আমি তো চলিলাম। একমাত্র ভগবান জানেন, আর দেখা হইবে কি না। কিন্তু বন্ধুকে ভুলিও না। দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ—চার বৎসর! কিন্তু কি আর করা যায়! বন্ধুকে মনে রাখিও—আর তাহার খ্যাতির প্রতি দৃষ্টি রাখিও।

যে হেতু আমি কবি, কাজেই একটা কবিতা না লিখিয়া কি করিয়া যাই? যাহা লিখিয়াছি, পাঠাইলাম।

বঙ্গ-ভূমির প্রতি

(সোনাই—সন ১২৬৯ সাল, খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬২)

My Native land, Good Night!—*Byron*

রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে,
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন ক'রো না গো তব মনঃকোকনদে!

প্রিয় রাজ, এখন একমাত্র অনুরোধ করিতে পারি—
মধুহীন ক'রো না গো তব মনঃকোকনদে!"

* * *

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন এস্. এস্, ক্যাণ্ডিয়া জাহাজে মাইকেল মধুসূদন ইংলণ্ড রওনা হইলেন।

রাবণের দ্বারা অপহৃত হইবার সময়ে মধুসূদনের সীতা যেমন রত্ন-অলঙ্কার ফেলিয়া পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিল, কবিও তেমনই পথের ইতিহাস পত্র দ্বারা বন্ধুদের জানাইতে জানাইতে চলিলেন। কখনও সে চিঠির উপরে ঠিকানা—'মাল্টার নিকটে', কখনও 'স্পেনের উপকূলের নিকটে', কখনও চিঠিতে উল্লেখ আফ্রিকার বন্ধুর গিরিমালার।

তারপরে একদিন সত্য সত্যই মাইকেল জুলাই মাসের শেষে ইংলণ্ডে আসিয়া পৌঁছিলেন।

মহাকাব্য লিখিত হইয়াছে; ইংলণ্ড পদতলে। মাইকেল ভাবিলেন, তাঁহার জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগত—তাঁহার অদৃষ্ট কি ভাবিয়াছিল যথাসময়ে দেখা যাইবে!

* * *

কেবল নব্য-বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, নব্য-ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও মধুসূদন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি—এই সত্যটি এখনও আমাদের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, আর সেইজন্যই মধুসূদনকে কেবল সাহিত্যিক বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। মধুসূদনের স্বভাবের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে নব্য-ভারতের স্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান পুরুষ বলিয়া মনে হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইউরোপের রেনেসাসের দৃষ্টি ভারতীয়দের মধ্যে প্রথমে রামমোহন লাভ করিয়াছিলেন—কবিদের মধ্যে মধুসূদন প্রথমে।

সত্য কথা বলিতে কি, মধুসূদনের বাংলা কাব্য রচনার আগেই বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল—বিদ্যাসাগরের গদ্যে, রঙ্গলালের কাব্যে, প্যারীচাঁদের গল্পে। কিন্তু এ সকল প্রয়াসের মধ্যে কোথায় যেন কি ত্রুটি ছিল, যাহার ফলে বাঙালীর চিত্তকে সম্পূর্ণভাবে নাড়া দিতে পারে নাই—ইউরোপীয় চিত্তের সঙ্গে ভারতীয় বাঙালীর চিত্তের অন্তরঙ্গতা ঘটে নাই, মাইকেলের হাতে এই ঘটনা ঘটিল। এই অন্তরঙ্গতার বাহন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইউরোপীয় প্রবাহের উপযুক্ত বাহন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। এই বাহনের অভাবেই ইউরোপীয় প্রভাব আমাদের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াও, ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতে পারে নাই।

ঊনবিংশ শতকে ভারতীয় সভ্যতার পক্ষে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুইটি ঘটনা হইতেছে—সুয়েজ খাল খনন ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা; দুইটি ঘটনাই ঊনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে ঘটিয়াছিল। একটির প্রভাব আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, কারণ আমাদের বাহিরের জীবন তাহার প্রভাবে অনেক পরিমাণে বদলাইয়া গিয়াছে; আর একটির প্রভাব এখনও সম্যক্ বুঝিতে পারি নাই, কারণ তাহার প্রভাব অন্তর্জীবনে; সে প্রভাব চোখে ধরা না পড়িলেও প্রথমটার চেয়েও তাহা আমূলব্যাপী।

সুয়েজ খাল খননের আগেও ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু পথের দীর্ঘতার জন্য সে সম্বন্ধ ছিল ঘাটের সম্বন্ধ, সুয়েজ খাল খননে এই দীর্ঘতার মধ্যে ছয় হাজার মাইল উড়িয়া গেল—ঘাটের সম্বন্ধ ঘরের সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচনার আগে ইউরোপীয় প্রভাব বাংলা সাহিত্যে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া আসিত; মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ দুই বিভিন্ন মনের মধ্যে মিলনের হ্রস্বতম পথ খুলিয়া দিল—বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় প্রভাবের সত্যযুগ আরম্ভ হইল।

বাহিরে যাহা সুয়েজ খাল, অন্তরে তাহাই অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

ইউরোপীয় প্রভাব এদেশে আসিয়াও কেন যে আমাদের চিত্তকে নাড়া দিতে পারে নাই, তাহার কারণ এতদিন সে তাহার যথার্থ মাধ্যমটি লাভ করে নাই—এবারে অমিত্রাক্ষর ছন্দে সেই মাধ্যমটি সে লাভ করিল। ভারতীয় স্থিতিশীল চিত্তের বাহন দেবরাজের ঐরাবত—যাহার গমনের তালকে আমরা বলি গজেন্দ্রগমন; আর ইউরোপীয় গতিশীল চিত্তের বাহন দেবরাজের উচ্চৈঃশ্রবা—যাহার গমনের তালকে বলিতে পারি অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান যে লক্ষণ দ্রুতি বা চলতা, অমিত্রাক্ষরের যতি-পাতের অব্যাহত স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতায় তাহার প্রকাশ; অমিত্রাক্ষরের অভাবে এতদিন ইউরোপীয় সভ্যতার বহিরঙ্গ মাত্র বাংলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—অন্তরতম গুণ এ সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।

ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান যে ধর্ম—চঞ্চলতা ও সভ্রম, অমিত্রাক্ষরের উত্তাল ছন্দঃস্পন্দে যাহার প্রকাশ, অকস্মাৎ তাহার অভাবনীয়তা স্থির ভারতীয় চিত্তকে মুহুর্মুহু কম্পিত সচকিত করিয়া তুলিল—"যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে।"

সুয়েজ খাল কাটা না হইলে এই দুই দেশ যেমন গভীরতর পরিচয় লাভ করিত না, অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচিত না হইলে এই দুই চিত্তের মধ্যে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বও উপস্থিত হইত না। আর এ প্রভাব প্রধানত সাহিত্যকে প্রভাবিত করিলেও সমগ্র জীবন ইহার গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে—কারণ সাহিত্য যেমন দ্রুত জীবনকে প্রভাবিত করিতে পারে, তেমন আর কিছু নয়, কাজেই মধুসূদনের প্রভাব প্রত্যক্ষত সাহিত্যিক প্রভাব হইলেও, পরোক্ষত তাহা সমগ্র নব্য-ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে; মধুসূদনকে যত বড় আমরা মনে করি—তিনি তাহার চেয়েও বড়; তিনি ইউরোপীয় প্রভাবের মহত্তর ভগীরথ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় ভাগীরথী আমাদের চিত্তকে সত্যই কি সঞ্জীবিত করিয়াছে? কপিলের অভিশাপ সত্যই কি ঘুচিল?

মাইকেলের প্রথম কাব্য—ক্যাপ্‌টিভ লেডি, বন্দিনী নারী। শুধু এই প্রথম কাব্যে মাত্র নয়—তাঁহার অধিকাংশ কাব্যেই নায়িকা বন্দিনী; বস্তুত তাহার প্রায় সকল গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ চরিত্র নারী, এবং সে নারী বন্দিনী নারী।

শর্ম্মিষ্ঠা দাসত্বে বন্দিনী; কৃষ্ণকুমারী রাজকন্যা, কিন্তু সে রাজনীতির পাশে বন্দিনী; পদ্মাবতী শচী ও মুরজার ঈর্ষাচক্রে বন্দিনী; ইন্দুমতী সর্ব্বনাশা প্রেমের বন্ধনে বন্দিনী; সীতা অশোকবনে বন্দিনী; প্রমীলা বীরবালা হইয়াও, স্বয়ং রামচন্দ্র যাহাকে ভয় করিয়া চলেন—মেঘনাদকে রক্ষা করিতে পারিল না, সে কুলাচারে বন্দিনী; বীরাঙ্গনার নায়িকারা সকলেই বীররমণী, কিন্তু অবস্থাধীনে তাহারা সকলেই বন্দিনী, এমন কি মঙ্গাকাননের পাষাণমূর্ত্তি যে শাপভ্রষ্টা ইন্দিরা, সে পাষাণ-কলেবরে বন্দিনী; আর ব্রজাঙ্গনার রাধার কুলমানের ভয় নাই, তবু সে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিতেছে না, সে প্রেমের প্রকৃতিগত সঙ্কোচে আপনার হৃদয়ে আপনি বন্দিনী।

মধুসূদনের সব কাব্যই বন্দিনী নারীর বিলাপধ্বনিতে পূর্ণ।

ইউরোপে গত চার শত বৎসর ধরিয়া ব্যক্তিত্বের বন্ধন-মোচনের প্রয়াস চলিতেছে—ইউরোপীয় সাহিত্য ব্যক্তিত্বের বন্ধন-মোচনের সাহিত্য। উগ্র ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনে সমাজ-দেহ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—উপরে আছে রাষ্ট্র, আর তাহার নীচেই খণ্ড খণ্ড বিশিষ্ট ব্যক্তি; রাষ্ট্রের চাপে ব্যক্তির আর্ত্তনাদ ইউরোপের ইতিহাস; এক সময়ে রাষ্ট্র ও সমাজ পরস্পর-প্রতিপূরক ছিল; একের প্রভাবকে অপরে বাধা দিতে পারিত; এইরূপে সভ্যতার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষার কাজ চলিত। কিন্তু সমাজ বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রভাবকে বাধা দিবার মত শক্তি আর থাকিল না; রাষ্ট্রপেষিত ব্যক্তিত্ব সাহিত্যের মধ্য দিয়া বুকফাটা হাহাকার করিয়া উঠিল।

ইউরোপীয় সাহিত্যের স্পর্শে আমাদের দেশেও ব্যক্তিত্ব-মোচনের প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল; সমাজ-দেহ ভাঙিতে আরম্ভ করিল; ব্যক্তিত্বের চেয়ে মহত্তর আর কোন সত্তা আমাদের চোখে ধরা পড়িল না। আবার রহস্য এই যে, কেহ কেহ ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের নামেই সমাজকে ভাঙিতে আরম্ভ করিল—যেমন ব্রাহ্মসমাজ; ব্রাহ্মসমাজ সমাজহীন সমাজ; আর সমাজ না থাকিলে ধর্ম্ম থাকিবে কি করিয়া! মানুষে মানুষে যদি মিলন না ঘটাইতে পারে, তবে সে ধর্ম্মের এমন কি মূল্য! সমাজের ভিত্তিতেই মানুষ মিলিতে পারে—ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে নয়; ব্যক্তিত্বে প্রভেদ ঘটে, মিলন নয়। মিলনের এই প্রশস্ততম ক্ষেত্র ভাঙিয়া গিয়াছে বলিয়া আর বাঙালী, শিক্ষিত বাঙালী, মিলিতে পারিতেছে না; না রাষ্ট্রনীতিতে, না ধর্ম্মে, না সমাজতন্ত্রে, না সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। ইদানীং কালের বাঙালী মিলিত হইয়া কোন বড় কাজ করিতে পারে নাই; একক যাহা করা যায়, সে ক্ষেত্রে অনেক মহৎ কাজ

করিয়াছে; আর এককের চরম সাধনা যে সাহিত্য—তাহাতে বাঙালী সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করিয়াছে।

মধুসূদনের সময় হইতেই সাহিত্যে এই ব্যক্তিত্বের বন্ধন-মোচনের প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার নারী-চরিত্রগুলিতে এই বন্ধন-মোচনের প্রয়াস, এই বন্ধনেই তাহারা বন্দিনী; এই বন্ধনের বিলাপেই মধুসূদনীয় সাহিত্য পরিপূর্ণ।

* * *

মেঘনাদবধের রাবণ বাল্মীকির রাবণ নয়। মেঘনাদবধের রাবণের অনুপ্রেরণার মূলে বায়রনের বিদ্রোহী নায়কগণ—আবার তাহাদের মূলে মিল্টনের শয়তান।

মেঘনাদবধের রাবণের অনুপ্রেরণার এই একটি দিক; আর একটি দিক তৎকালীন, মধুসূদনের সমকালীন সমাজ-বিদ্রোহের ভাব; এই আর্য্যদ্রোহী, অনাচারী, দুর্দান্ত, ঐশ্বর্য্যবান্ রাবণ-চরিত্রে তৎকালীন ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজ আপনার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে; বস্তুত সেকালের ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী, হিন্দু কলেজের বাঙালী ছাত্র, ডিরোজিওর ছাত্রগণ—প্রত্যেকেই এক একজন ক্ষুদে রাবণ ছিল; মধুসূদন সমাজের এই নূতন চৈতন্যকে তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তৎকালীন বাঙালীর মানসমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন; এই রাবণ-চরিত্রের মধ্যে বাঙালীর একটা সমগ্র যুগের ইতিহাস ভাস্বর হইয়া আছে।

উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে একটি দ্বৈতভাব আছে; চিরকালের রথী নূতন কালের রথে আবির্ভূত হন; রাবণের প্রাণসাধা চিরকালের, কিন্তু যে রথে তাহার আবির্ভাব, তাহা বিশেষ করিয়া তাৎকালিক—মধুসূদনের সমকালিক।

বৃত্রসংহারে বৃত্র যে ছায়া মাত্র—তাহার কারণ হেমচন্দ্র তাহাকে নূতন কালের রথে চাপাইয়া আসরে টানিয়া আনিতে পারেন নাই; তাহার ভাষা আমরা বুঝি না, তাহার গতিবিধিতে আমরা অভ্যস্ত নাই, তাহার আচার-ব্যবহার কোন্ অপরিচিত যুগের—সবসুদ্ধ মিলিয়া তাহার চরিত্র আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য—সে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না।

রাবণ-চরিত্র যে কেবল আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয় তাহা নয়—এককালে আমরাই রাবণ ছিলাম।

* * *

মধুসূদনের কবি-কল্পনা রোমান্টিক কল্পনা, যেমন মিল্টনের কল্পনা রোমান্টিক।

রোমান্টিক কল্পনার একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহা বীভৎসে সৌন্দর্য্যের আরোপ করে; ভীষণে মাধুর্য্যের সঞ্চার করে; দুরধিগম্যকে লোভনীয় করিয়া তোলে; দূর চক্রবালের ধনুকখানাকে বাঁকাইয়া আনিয়া প্রায় করায়ত্ত করিয়া দেয়।

ইউরোপে রোমান্টিক কল্পনার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মূলত বীভৎস, ভীষণ, রুদ্র শয়তান-চরিত্রে বিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। মিল্টনের আগেই শয়তান চরিত্রে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু প্রধানত মিল্টনের হাতে পড়িয়াই শয়তান একাধারে বীভৎস-সুন্দর, ভীষণ-মধুর, দুষ্প্রাপ-লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে। শয়তানের মানসিক বংশধর বায়রনীয় নায়কগণের মধ্যেও এই একই লক্ষণ—রোমান্টিক কল্পনার এই একই প্রক্রিয়া।

মধুসূদনের রাবণেও রোমান্টিক কবি-কল্পনার এই একই লীলা; রাবণ একাধারে বীভৎস-সুন্দর, ভীষণ-মধুর, দুষ্পাপ-লোভনীয়; সে কঠোরে কোমল, সে অশ্রুতে নির্ঘৃণ, ভগ্নাগ্রহের বিষম ধাতুতে তাহার শরীর গঠিত।

মধুসূদন সম্বন্ধে ক্ল্যাসিকাল শব্দটা বাংলায় বড় প্রচলিত, সেইজন্য এত কথা বলিতে হইল। তাঁহার রোমান্টিক কল্পনা সম্বন্ধে সচেতন না হইলে তাঁহার কাব্য ভুল বুঝিবার আশঙ্কা আছে।

* * *

কবি মধুসূদনের কাছে জীবনের সবচেয়ে বড় রহস্য ছিল অদৃষ্টতত্ত্ব; অদৃষ্টতত্ত্ব কখনও তিনি সম্পূর্ণভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার সব কাব্যেই অদৃষ্টের লীলার গোপন পদসঞ্চারকে অনুসরণ করিবার প্রয়াস।

মেঘনাদবধের রাবণ ও রাম কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, কি পাপে তাহাদের এই দুর্গতি।

বীরাঙ্গনায় একাধিক নায়িকার মুখে এই একই প্রশ্ন। বড়জোর তাহারা বলিতেছে যে, অদৃষ্টের ফল তাহারা ভোগ করিতেছে; কিন্তু কেন অদৃষ্টের এই বিশেষ ফল তাহা তাহারা জানে না।

গ্রীকরা অদৃষ্টতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই—একটা গোঁজামিল দিয়া গিয়াছিল। ভারতীয়েরা পূর্ব্বজন্মবাদের দ্বারা অদৃষ্টের ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে—কিন্তু ইহাতেও আদি রহস্য ধরা পড়ে না।

মধুসূদনের কাব্যে গ্রীক অদৃষ্টবাদের গোঁজামিল আছে; ভারতীয় কর্ম্মফল আছে—তাহা ছাড়াও অদৃষ্টের নূতন ব্যাখ্যার চেষ্টা আছে।

নেপোলিয়ান বলিতেন—অদৃষ্ট! অদৃষ্ট কি? রাজনীতিই অদৃষ্ট। অর্থাৎ আধুনিক যুগে রাজনীতিই অদৃষ্টের স্থান অধিকার করিয়াছে। রাজনীতির এক দাবার চালে দেশসুদ্ধ লোকের সুখদুঃখের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে—ইহাই তো অদৃষ্ট।

মেঘনাদবধে রাজনীতিই অদৃষ্টের স্থান অধিকার করিয়াছে। বাল্মীকির রাবণ যে কারণেই সীতাহরণ করুক, মধুসূদনের রাবণ রাজনীতির জন্য সীতাহরণ করিয়াছে। লক্ষ্মণ

তাহার ভগ্নী সূর্পণখাকে অপমান করিয়াছিল ; রাবণ তাহার সমুচিত বিধান করিবার মানসে সীতাহরণ করিয়াছিল। প্রশ্ন উঠিতে পারে—লক্ষ্মণের অপরাধে সীতাকে হরণ কেন? তাহার কারণ উর্ম্মিলা সেখানে ছিল না—থাকিলে রাবণ নিশ্চয় সীতাকে হরণ না করিয়া উর্ম্মিলাহরণ করিত। আর আধুনিক যুগের রাজারা সীতা বা উর্ম্মিলা কাহাকেও হরণ না করিয়া প্রতিপক্ষের সোনার খনি বা তেলের খনিটি জবরদখল করিয়া লইতেন। রাজনীতির জন্য সীতাহরণ—আর অদৃষ্টের এই প্রথম চাল হইতে পরবর্ত্তী সমস্ত দুঃখের উদ্ভব।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে সুন্দ-উপসুন্দের প্রতাপে ইন্দ্র স্বর্গ হইতে বিতাড়িত। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখিতেছেন—"ইন্দ্র বীরপুরুষ বটে, কিন্তু সে অদৃষ্টের বিরুদ্ধে কি করিবে?"

অদৃষ্টের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার নাই। এখানেও সেই অদৃষ্টতত্ত্বের গ্রন্থিকে বিচার করিবার প্রয়াস।

কৃষ্ণকুমারী নাটকেও রাজনীতি অদৃষ্টের স্থান অধিকার করিয়াছে।

কৃষ্ণকুমারীর ভাগ্যে আত্মনাশ লিখিত হইত না, যদি সে রাজকুমারী না হইত। তাহার বিবাহ-ব্যাপার লইয়া উদয়পুররাজ, জয়পুররাজ আর অপর দিকে মরুরাজ, মহারাষ্ট্রাধিপতিতে যুদ্ধ বাধিবার উদ্যোগ। রাজনীতির এক চালে চারটি রাজ্যে যুদ্ধোদ্যম ; চারটি রাজ্যের সহস্র সহস্র সৈন্য প্রাণদানের প্রান্তে আসিয়া দণ্ডায়মান। রাজনীতি-অদৃষ্টকে ক্ষান্ত করিবার জন্য কৃষ্ণকুমারীকে আত্মনাশ করিতে হইল।

দৈত্যরাজ শুক্রাচার্য্যকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীরূপে প্রেরণ করিল। শর্ম্মিষ্ঠার দাসত্বের মূলে কি? অর্থাৎ অদৃষ্টের কোন্ চালে তাহাকে রাজকন্যা হইয়াও দাসী হইতে হইল?

দৈত্যরাজ শুক্রাচার্য্যকে ভয় করিতেন, কেন না শুক্রাচার্য্য দৈত্যগুরু ; রাজ্যরক্ষার জন্যই হোক, অভিশাপের ভয়েই হোক, অদৃষ্ট এখানে স্বয়ং পিতৃরূপে আবির্ভূত।

পদ্মাবতীতে পদ্মাবতীর সমস্ত দুঃখের মূলে ইন্দ্রনীলের সৌন্দর্য্যবোধ। শচী, মুরজা, রতির মধ্যে কে সুন্দরতম? রতি সুন্দরতম হইতেও পারে, আবার না হইতেও পারে, কিন্তু যে সৌন্দর্য্যবোধের ফলে সে রতিকে সুন্দরতম বলিল, নাটকের পরবর্ত্তী দুঃখের উদ্ভবের মূলে তাহা ছাড়া আর কিছু নয়। সৌন্দর্য্যবোধ এখানে অদৃষ্টের স্থানে অধিষ্ঠিত।

সুন্দ-উপসুন্দের সর্ব্বনাশের মূলে আসক্তি।

আর মায়াকাননে ইন্দুমতী-অজয়ের আত্মনাশের মূলে পরস্পর প্রণয় ; প্রেম এখানে অদৃষ্টের স্থান অধিকার করিয়াছে।

মধুসূদন অদৃষ্টের রহস্য বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই মানুষের সমস্ত সুখদুঃখ

ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মূলে কখনও ভাবিয়াছেন আছে প্রেম, কখনও সৌন্দর্য্যবোধ, কখনও রাজনীতি, কখনও কর্ম্মফল, কখনও আসক্তি, কখনও বা পিতার খেয়াল, কখনও বা অনির্দ্দেশ্য কিছু, যেমন তিলোত্তমা-সম্ভবের ইন্দ্রের ভাগ্যে।

মধুসূদন হয়তো অদৃষ্ট-রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই; তাহাতে কিছু যায় আসে না, কারণ এ পর্য্যন্ত কেহই এ শেষ রহস্য ভেদ করিতে পারে নাই। এ ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষণীয় এই যে, অদৃষ্টতত্ত্বের লীলার মানচিত্র রচনাই মধুসূদনের কাব্যের মূল ভাব-উপজীব্য।

মাইকেল মধুসূদনের নিজের জীবনে অর্থনীতিই অদৃষ্টের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। অর্থনীতি-জ্ঞান অন্যরূপ হইলে তাঁহার জীবনের গতিও অন্যরূপ হইত।

* * *

মধুসূদনের শিল্পবোধের তিনটি ধাপ। প্রথম ধাপে তাঁহার আদর্শ—মূর, বায়রন, স্কট; ইঁহাদের কাব্যাদর্শে তাঁহার কাব্য-রচনার আরম্ভ; তাঁহার সমস্ত ইংরেজী কাব্যের মূলে ইঁহাদের অনুপ্রেরণা; ইংরেজী কাব্যের যুগ শেষ হইয়া বাংলা কাব্যের যুগ আরম্ভ হইবার সময়ে তাঁহার আদর্শ মিল্টন; কিংবা সত্য কথা এই যে, মিল্টনীয় প্রয়াস ইংরেজী কাব্যে সম্ভব নয় বলিয়াই তিনি বাংলা কাব্য রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। মূর, বায়রন, স্কটের প্রভাব তখন তাঁহার মন হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। রঙ্গলাল তখনও ইঁহাদের কাব্যকে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা মনে করেন বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ধাপে মিল্টন—ইহাই মধুসূদনের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তির সময়।

তৃতীয় আর একটি ধাপের সূচনা মাত্র দেখা যায়—তাহার অধিদেবতা শেক্সপীয়র। নিজের ট্র্যাজেডির ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করিবার উপলক্ষ্যে তিনি কেশব গাঙ্গুলীকে লিখিয়াছেন—"আমি যে দৃষ্টিতে এই ব্যাপারকে দেখিয়াছি, খুব সম্ভব শেক্সপীয়রও সেই দৃষ্টিতে ইহা দেখিতেন।"

শেক্সপীয়রীয় দৃষ্টি! মূর, বায়রন, স্কট হইতে অনেক দূরে মধুসূদন আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার কাব্যে শেক্সপীয়রীয় দৃষ্টির সূচনা মাত্র আছে। কিন্তু তাঁহার সমগ্র কাব্যজীবনই যে মহত্তর কাব্যজীবনের সূচনা মাত্র। মহত্তর, কিন্তু অনারব্ধ। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্যসকল সম্পূর্ণ অলিখিত রহিয়া গিয়াছে। তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে অপূর্ণ সম্ভাবনার মহাকবি।

স্বর্ণমৃগ
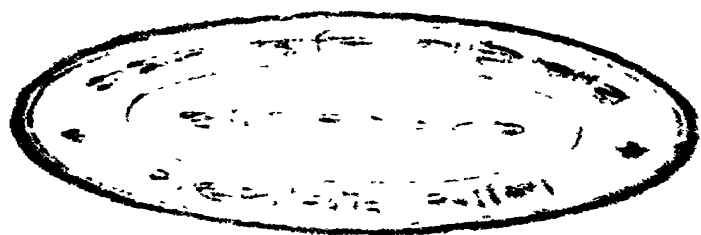
"আর কবি মধুসূদন নয়; এবারে মাইকেল এম, এস, ডাট এস্কোয়ার অব দি ইনার টেম্প্‌ল, ব্যারিষ্টার-অ্যাট-ল!—হাঃ হাঃ, কেমন, চমৎকার নয়?"

"আমি আমার স্ত্রীকে বলিয়া থাকি—কলিকাতায় ফিরিলে তোমার বাড়িতে থাকিবার জন্য একখানি ঘর ও জীবনধারণের উপযোগী প্রচুর অন্ন দিবে।"

অবশেষে ইংলণ্ড।
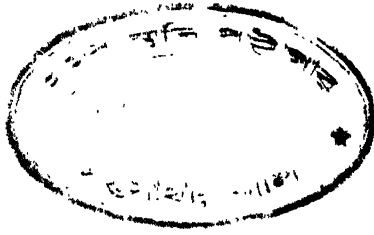
লণ্ডনে গ্রে'জ ইনে মধুসূদন ব্যারিস্টারি শিক্ষার জন্য ভর্তি হইলেন; এতদিন পরে সমস্ত জীবনের সাধ যেন পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, মধুসূদন দত্ত আর কবি মাত্র বলিয়া পরিচিত হইবেন না, অচিরে লোকে তাঁহাকে মিঃ এম, এস, ডাট এস্কোয়ার ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল বলিয়া জানিবে।

কিন্তু যে বিধি পদে পদে তাঁহাকে ব্যাহত করিয়াছে, যে পথ তাঁহার নয় সে পথে চলিতে বাধা দিয়াছে, সে ছাড়িবে কেন? সেও মধুর সঙ্গে একই জাহাজে ইংলণ্ডে আসিয়াছিল, এবার সে নিজের কাজ আরম্ভ করিল।

মহাদেব চাটুজ্জে নামে যে লোককে মধুসূদন সম্পত্তি পত্তনি দিয়া আসিয়াছিলেন, নিয়মিত যাহার টাকা দিবার কথা ছিল, সেই মহাদেব চাটুজ্জের মাহেন্দ্র ক্ষণ উপস্থিত হইল; সে টাকা পাঠানো—বিদেশে মধুসূদনকে ও দেশে তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে—বন্ধ করিল।

মহাদেব চাটুজ্জের দোষ দেওয়া যায় না, সে কৃতী পুরুষ। পাওনাদার পাশের বাড়িতে থাকিয়া টাকা আদায় করিতে পারে না; আর সে কিনা ছয় সাত হাজার মাইল দূরে! টাকা আদায় করিবে কে?—ওই অসহায়া রমণী আর নাবালক পুত্র? মহাদেব চাটুজ্জে এসব কথা ভাবিয়া বোধ হয় খুব এক পেট হাসিয়া লইয়াছিল। অবশ্য তাহার জামিন ছিলেন দিগম্বর মিত্র। লোকটি ধনী; কাজেই কি ভাবে সে কাজ করিবে, মহাদেব তাহা জানিত। সে নিশ্চিন্ত হইয়া টাকা দেওয়া বন্ধ করিল।

সংসারে সবচেয়ে কঠিন কাজ পাওনা টাকা আদায়। ধার পাওয়া সহজ, সুদের আশা আছে; দান পাওয়া সহজ, নামের আশা আছে; কিন্তু পাওনা টাকা দিলে

না আছে কৃতিত্ব, না আছে মহত্ত্ব, বড়জোর লোকে বলিবে, লোকটা সাধু প্রকৃতির। কিন্তু মহাদেব চাটুজ্জের দলের তাহাতে পেট ভরে না।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে হেনরিয়েটা পুত্র ও কন্যাকে লইয়া ইংলণ্ডে মধুসূদনের কাছে আসিয়া পৌছিলেন। অনাহারে তাঁহারা দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

মধুসূদনের একেই খরুচে স্বভাব, তাহাতে দেশ হইতে টাকা আসা অনিয়মিত হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় স্ত্রী ও সন্তানেরা আসিয়া পড়াতে তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন। সেই বছরের মাঝামাঝি তাঁহারা সকলে প্যারিসে চলিয়া আসিলেন। পরে ব্যয় আরও সংক্ষেপ করিবার জন্য ভার্সাই শহরে আসিয়া বাসা লইলেন। এখানে প্রায় আড়াই বছর কাল তাহাদের থাকিতে হইয়াছিল।

মধুসূদন ফরাসী দেশ ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। এখন তিনি সশরীরে ফরাসী দেশে; সেই দেশ, সেই জাতি, সেই ভাষা ও সাহিত্য, সেই আবহাওয়া; কিন্তু সবই কেমন লাবণ্যহীন! টাকা নাই, আসিবারও কোন লক্ষণ নাই; চিঠি নাই, লিখিলেও কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

সঞ্চিত যাহা ছিল, ফুরাইয়া গেল। তারপর বন্ধক দেওয়া শুরু হইল—গৃহসজ্জা, পত্নীর আভরণ, পুস্তকাবলী, তৈজসপত্র। এমন কি, শেষে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সেই পান-পাত্রটা। বোধ হয় ইদানীং অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে মধুসূদনের সুসজ্জিত গৃহ শূন্য হইয়া পড়িল। বোধ হয়, দীপালোক জ্বালিবার অর্থও ছিল না—ইচ্ছা করিলে কবি রাবণের মত বলিতে পারিতেন—

> "কুসুমদামসজ্জিত, দীপাবলীতেজে
> উজ্জ্বলিত নাট্যশালা-সম রে আছিল
> এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
> শুকাইছে ফুল এবে নিবিছে দেউটি;
> নীরব রবাব বীণা,—মুরজ মুরলী;"

তারপরে ঋণ করা আরম্ভ হইল, ক্রমে অদৃষ্টের অমোঘ নাগপাশে আষ্টে-পৃষ্ঠে বদ্ধ হইয়া নবতর লাওকুনের মত মহাকবি সপরিবারে ভীষণ সৌন্দর্য্যে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

কিন্তু এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে! অবশেষে মধুসূদনের মস্তিষ্কে নব-নব-উন্মেষশালিনী প্রতিভার এক বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। মুক্তির উপায় মনে পড়িল---এই উপায়টি মধুসূদনের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। সময়মত ইহা মনে না পড়িলে হয়তো তাঁহাকে সপরিবারে বিদেশের কারাগারে ও কবরে নিবদ্ধ থাকিতে হইত।

দেশে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের অভাব ছিল না। তাঁহাদের অনেকে ধনী, অনেকে প্রতিপত্তিশালী ; কিন্তু চুরম বিপদের সময়ে যাঁহার নাম মনে আসিল তিনি ধনী নন, রাজা নন, তিনি তাঁহার মত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক; তিনি তাঁহারই মত একজন সাহিত্যিক ; তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দেশে থাকিতে মধুসূদন বিদ্যাসাগরের প্রকৃত মহত্ব বুঝিতে পারেন নাই ; হয়তো নিজের চেয়ে তাঁহাকে ন্যূন মনে করিতেন, বড়জোর নিজের সমকক্ষ মনে করিতেন। বিদেশে দুঃসময়ে মধুসূদন বুঝিতে পারিলেন—বিদ্যাসাগর তাঁহার চেয়ে কত বড়! দেশে যিনি ছিলেন বন্ধু, বিদেশে তিনি গুরুরূপে প্রতিভাত হইলেন।

এই সময়ে বিদ্যাসাগরকে লিখিত চিঠিগুলিতে মধুসূদনের যে করুণ চিত্র দেখিতে পাই, এমন আর কিছুতে নয়।

২রা জুন, ১৮৬৪

"বন্ধুবর,

তুমি যদি সাধারণ লোক হইতে, তবে এতদিনের নিস্তব্ধতার জন্য আজ আমাকে নানা ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তবে পত্রের মুখবন্ধ আরম্ভ করিতে হইত। নিশ্চয়ই জান—অকপট বন্ধু বা শুভানুধ্যায়ী ভিন্ন অন্যের নিকটে কেহ তাহার নিতান্ত দুঃসময়ে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হয় না। শুনিয়া বিস্মিত হইবে—যে লোক দুই বৎসর আগে উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষা লইয়া সমুদ্রযাত্রার প্রারম্ভে তোমার নিকট বিদায় লইয়াছিল, সে আজ তাহার বন্ধু-বান্ধবদের হৃদয়হীন ব্যবহারে—ভগ্ন ও মৃতপ্রায়। সমস্ত ঘটনা একটি হৃদয়হীন নিষ্ঠুর গল্প মাত্র—তোমাকে গোপনে বলিতেছি।

কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে আমার পত্তনিদার মহাদেব চাটুজ্জের সহিত ব্যবস্থা করি যে, সে পত্তনির মুনাফা মাসিক ১৫০৲ হিসাবে আমার স্ত্রীকে দিবে। এই বিষয় পর্য্যবেক্ষণের ভার বন্ধু দিগম্বর মিত্র স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, এবং সে সময়ে কিছু টাকা আদায় করিয়া আমি **Oriental Bank**-এ জমা রাখিয়া আসি। কিন্তু তারপর তাহারা আমার স্ত্রীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা লিখিতে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে। অবশেষে তাঁহাকে আমার শিশুপুত্রদ্বয় সহ কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। তাঁহারা ১৮৬৩

খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতেই আমার তালুকের পত্তনির মুনাফা মহাদেব এক আধলাও দেয় নাই। শুধু তাই কেন, বন্ধুবর দিগম্বরকে আটখানা পত্র লিখিয়াও এ পর্য্যন্ত জবাব পাইলাম না, তাহার শেষ চিঠিখানা পাই ঠিক আজ হইতে দশ মাস আগে।

দেশে আমার ন্যায্য পাওনা ৪০০০ টাকা বাকি থাকিতেও আজ আমি অর্থাভাবে ফরাসী জেলের দরজায় এবং আমার স্ত্রী শিশুপুত্রসহ অনাথ-আশ্রমে যাইতে বসিয়াছেন। গ্রে'জ ইন হইতে ৪৫০ টাকা ধার করার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে সাস্‌পেণ্ড করিয়াছেন। এ বছরের তৃতীয় টার্‌ম চলিয়া গেল, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল হইল না; অপর একটি বন্ধু আমার নিকট ২৫০ টাকা পায়, সে বেচারার টাকার খুবই দরকার, কিন্তু আমি নিরুপায়।

বন্ধুদের ব্যবহারে আমি যে অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহাতে একমাত্র তোমার দয়া এবং প্রতিভার কণামাত্র ভিন্ন কোনরূপে আর কেহ আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না—ইহা নিশ্চয়ই জানি। কিন্তু বন্ধু, এক মুহূর্ত্ত বৃথা ব্যয় করিও না। কলিকাতায় আমার যে জমিদারি আছে, তাহার আয় বাৎসরিক ১৫০০ টাকা। নিশ্চয়ই জান যে, ঐ সম্পত্তিঘটিত সমস্ত মামলা-মোকর্দ্দমা মিটিয়া গিয়াছে এবং আমার স্বত্ব কায়েম হইয়াছে। বাবু দিগম্বর মিত্র এবং বৈদ্যনাথ মিত্র আমার কলিকাতার আমমোক্তার। তুমি ঐ জমিদারি-সম্পত্তি যদি তথাকার **Land Mortgage Society**তে বন্ধক রাখ, তবে ১৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত পাইতে পার। আবশ্যকীয় দলিলপত্র তাহাদের কাছেই পাইবে—ইহা খুবই প্রয়োজনীয় জানিও। কিন্তু জানিও, আমি সুদূর বিদেশে এবং সম্পূর্ণ সম্বলশূন্য, তাই পত্র-প্রাপ্তিমাত্র কিছু টাকা পাঠাইবে, যাহাতে এখানে আমরা অসহায় না হইয়া পড়ি। দেশে আমার কয়েকজন মহাজন আছে, তাহারা সকলেই আমার বন্ধুস্থানীয়। তুমি ঐ টাকা হইতে তাহাদিগকে কিছু কিছু দিও। আশা করি, তাঁহারা উহাতেই আমার দেশে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত সময় দিবেন, অবশিষ্ট ১১০০০ টাকা কিস্তিবন্দী করিয়া ছয় মাস অন্তর আমাকে পাঠাইবে, ইহাতেই ভরসা করি, পাঠ সমাপ্ত করিয়া মাতৃভূমিতে ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিতে সক্ষম হইব। যদি বন্ধু, কার্য্যটি শীঘ্র সমাধা করিতে না পার, তবে জানিও, আমাদের অনাহারে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

আশা করি, তোমার মহানুভবতা নিশ্চয়ই আমাদের বিদেশে অনাহারে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবে। উপরের ঠিকানায় পত্র দিও। উপরে স্বয়ং ভগবান এবং তাহার নীচেই একমাত্র তুমি ভিন্ন আর কেহ আমাদের এই ফ্রান্স ত্যাগ করাইতে অক্ষম। আজ আর লিখিবার মত মনের অবস্থা নয়। বিদায়।"

৯ই জুন, ১৮৬৪

"বন্ধুবর,

আশা করি, আমার ২রা জুন তারিখে লিখিত পত্রখণ্ড তোমার হস্তগত হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দিগম্বরকে আবার পত্র দিই—তাহার পত্রের উত্তরের আশায় থাকিয়া এবারও হতাশ হইলাম। এতদিন দিগম্বরকে সহৃদয়, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া জানিতাম। কিন্তু দুঃখের মধ্যে চিনিতে পারিয়াছি। বড়লোকের বন্ধুত্বের মূল্য কত অন্তঃসার-শূন্য, ন্যায়নিষ্ঠা কতই অসার, সহৃদয়তা হৃদয়হীনতায় পরিণত হইতে কত অল্প সময় লাগে! আমার মত দরিদ্রের পক্ষে তাহার কিছুই প্রতিকার করা অসম্ভব, কিন্তু হে স্পষ্টবাদী বিদ্যাসাগর! বল, সে তাহার নিজের বিবেককে কি বলিয়া বুঝাইবে?

জানিয়া সুখী হইবে যে, একটি তরুণী ফরাসী মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, সেই মহীয়সী ভদ্রমহিলা আমাকে নানা ভাবে অর্থ ও পরামর্শ দিয়া কতটা রক্ষা করিয়াছেন—তাহা এই ক্ষুদ্র পত্রে লেখা যায় না। তাহারই কৃপায় এই জুন মাস পর্য্যন্ত এই বাসায় থাকিবার অনুমতি পাইয়াছি, নচেৎ এতদিন নিশ্চয় ফরাসী কারাকক্ষে আমার স্থান হইত। ক্ষুধার তাড়নে এখানে কয়েকটি বন্ধুর নিকট ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে। আসবাবপত্র, এমন কি, স্ত্রীর অলঙ্কার পর্য্যন্ত বহুদিন বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু বন্ধু, আরও বড় বিপদ অপেক্ষা করিতেছে। সম্ভবত আগামী মাসেই আমার স্ত্রী প্রসব করিবেন।

পত্তনিদার মহাদেব সরল লোক নহে। তাহার নিকট ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের বকেয়া খাজনা ৫০০ টাকা বাকি। দিগম্বরকে বলিবে, যেন বকেয়া সাকল্য টাকার উপর শতকরা ১২৲ হিসাবে সুদ আদায় করে।

"আমি নিশ্চয় জানি, তুমি আমার বিষয়ে আগ্রহ দেখাইবে, কারণ কেহ কোন বিপদে পড়িয়া তোমার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে—তাহা তো শুনি নাই! জানি, কুলোকে তোমার পথে নানা বাধা সৃষ্টি করিবে—কিন্তু বিশ্বাস করি, হে অপরাজেয় বন্ধু! তুমি, সব্যসাচীর মত, আমার জন্য একা, হীনমতি মহাদেব এবং অন্যান্য চক্রান্তকারীদের সহিত যুদ্ধ করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করিবে না—এবং জয় তো তোমার ললাট-লিখন। এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ে আমার প্রবাসকাল এক বৎসর বাড়িয়া যাইবে; মনে আশা, এই দুই বৎসর মধ্যেই আমার ঈপ্সিত কার্য্য সমাধা করিয়া দেশে ফিরিব। দুই বৎসর মাত্র কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছি; কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এমন কষ্ট ও অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে পড়িব। কলিকাতাবাসী আমার নামে নানা মিথ্যা কথা তোমাকে লাগাইবে, কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিও না বন্ধু!—এই আমার মিনতি।

বন্ধকী ব্যাপার শেষ করিলে, মহাদেব চাটুজ্জের নিকট হইতে বাকি টাকার সুদ বা ক্ষতিপূরণ নিশ্চয়ই আদায় করিও। একমাত্র তাহার গাফিলতিতেই আমার এই দুর্দ্দশা! ইহা আমার দ্বিতীয় পত্র, আরও দুইখানা এই বিষয়েই তোমাকে এই মাসের শেষের দিকে লিখিব। জানি, তুমি আমার এই বিপদে অকপট বন্ধু।

শুনিয়া সুখী হইবে যে, এই দুশ্চিন্তা এবং বিড়ম্বনার মধ্যেও আমি ফরাসী ভাষা প্রায় শিখিয়া ফেলিয়াছি। আমি এখন ফরাসী ভালই বলিতে পারি এবং লিখিতে আরও ভাল পারি। ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। স্প্যানিশ ও পর্ত্তুগীজ ভাষা না শিখিতে পারিলেও, ইউরোপ ত্যাগের পূর্ব্বে জার্মান ভাষা নিশ্চয়ই শিখিয়া যাইব।

ফরাসীরা সাধারণতঃ বিদেশী ভাষা পছন্দ করে না, অথচ সংস্কৃত জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত ব্যক্তি এই ছোট শহরেও ছয়-সাতজন আছেন। এখানে আমি সংস্কৃত ভাষার একখানা চমৎকার ব্যাকরণ দেখিয়াছি। তাহার লেখক একজন ফরাসী। একজন ব্যক্তির সহিত এখানে আমার আলাপ হইয়াছিল, যিনি মনুসংহিতা বিশেষ যত্নের সহিত পড়িয়াছেন।

এইরূপ অর্থাভাব, দুর্ভাবনার মধ্যে আমার মনের ঠিক নাই; নচেৎ তোমাকে এই বিষয়ে বহু খবর পাঠাইতাম। আজ এই পর্য্যন্ত। ইতি—"

১৮ই জুন, ১৮৬৪

"সুহৃদ্বরেষু,

আজ তোমাকে আমি তৃতীয় পত্র লিখিতেছি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্র তোমাকে লিখিয়া মনে ক্ষীণ আশা পোষণ করিতাম যে, হয়তো ইতিমধ্যে দিগম্বর বা মহাদেবের প্রেরিত টাকা ও পত্র পাইব। আজ ডাকবার—আজ আবার হতাশ হইলাম। অর্থাভাবে অবশেষে এক ইংরেজ পাদ্রীর নিকট হাত পাতিতে হইয়াছে। পাদ্রী মহাশয় তাঁহাদের "দরিদ্রভাণ্ডার" হইতে অনেক বদান্যতা দেখাইয়া শেষে মাত্র নয় টাকা ধার দিলেন। দেশে যথেষ্ট টাকা পাওনা থাকিতে এবং জমিদারি থাকিতে আজ আমি বিদেশে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিতেছি। জানি না, সেই কুচক্রিগণ ভগবানের নিকট কি জবাবদিহি করিবে। যদি আমার সহিত আমার স্ত্রী এবং হতভাগ্য শিশুগণ না থাকিত, তবে জীবনের সব জ্বালা—অর্থ-কষ্ট, এই দৈন্য—সব এক নিমিষে চুকাইয়া দিতাম, কিন্তু, বন্ধু, বিধি তাহে বাম! অর্থকৃচ্ছ্রতা দুর্ব্বল মানুষের জীবনে মানসিক দৈন্য আনিয়া দেয়;

এবং ইহাতেই তাহার অধঃপতন হয়। এই অসম্ভব দীনতার মধ্যেও আজও আমি কেবলমাত্র আমার সবল হৃদয়ের কৃপায় খাড়া আছি, অন্য কেহ হইলে নিশ্চয় বলিতে পারি, এতদিন একটা শেষ কিছু করিয়া ফেলিত।

ইতিপূর্ব্বে দুইখানা পত্রেই আমার আর্থিক অবস্থা বিশেষরূপে লিখিয়াছি। সেই পত্রগুলি নিশ্চয় তোমার হস্তগত হইয়াছে, এবং এই পত্রখানা সুদূর প্রাচ্যে তোমার হাতে পৌছাইবার আগেই, তোমার প্রেরিত টাকা পাইব। এবারের মত আর পরীক্ষা দেওয়া ঘটিয়া উঠিল না। কলেজ গতকল্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে, আবার সেই ২রা নভেম্বর খুলিবে। দেখ, বন্ধু, গত তিন বারের মত এ টার্মও যেন আমার বৃথা না যায়। এই পত্রখানাতে হতাশার স্বর প্রতি ছত্রে পাইবে। কিন্তু বন্ধু, এই প্রবাসীর অর্থকষ্ট স্মরণ করিয়া, আশা করি, তাহা ক্ষমা করিবে। তোমার পত্র এবং টাকা যেন শীঘ্র পাই, নচেৎ দেশে গিয়া তোমার "করুণাসাগর" নাম প্রচার করিতে পারিব না। আজ আর বেশী কিছু লিখিব না, মানসিক অবস্থা একেবারে শেষ পর্দ্দায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। ইতি—"

* * *

"বন্ধুবর,

তোমাকে পত্র দেওয়ার পরে, সেদিন দিগম্বরের পত্র ও তাহার প্রেরিত মাত্র আট শত টাকা পাইলাম। মরুভূমিতে জলবিন্দু সিঞ্চন ভিন্ন ইহাকে আর কি বলিব! আশা করি, এই খবর জানিয়া, তুমি যেন তোমাকে অর্পিত কার্য্যগুলির দায় হইতে বাঁচিয়া গেলে—মনে না কর। কারণ সম্ভবত তোমার তাড়নায় দিগম্বর এই সামান্য টাকা পাঠাইয়াছে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তুমি নিশ্চিন্ত হইবে, সেই মুহূর্ত্তে সেও আবার সুখ-নিদ্রা আরম্ভ করিবে। তুমি উঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে যে, আমার কত টাকা উঁহাদের নিকট প্রাপ্য। দেখিবে—আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহার এক বিন্দুও মিথ্যা নয়। কলিকাতার Land Mortgage Society-তে আমার সম্পত্তি বন্ধক রাখার কথা লিখিয়াছি, তাহার সুদ শতকরা ৮ টাকা এমন কি ৯ টাকা হইলেও রাখিতে ইতস্তত করিবে না। হুকুম চাও? কিন্তু তোমাকে কি আমি হুকুম করিতে পারি? যাহা তুমি করিবে, তাহাতেই আমার পূর্ণ সম্মতি।

হে করুণাসাগর, তুমি যদি আমাকে টাকা না পাঠাও, তবে আমার সামনের নভেম্বরে ইংলণ্ডে যাওয়া ঘটিয়া উঠিবে না। এবং আমার চির-ঈপ্সিত ব্যারিস্টারি পাস করাও হয়তো চিরতরেই শেষ হইয়া যাইবে। কলিকাতায় যদি কেহ আমার বিষয় কিছু বলে, তাহা বিশ্বাস করিও না, বন্ধু। এই পত্রখানা অতি ক্ষুদ্র হইল, কিন্তু পূর্ব্বের পত্রগুলিতে সমস্ত সবিস্তারে লিখিয়াছি, সেইজন্য আজ আর লিখিলাম

না। আজ এই বিদায়ের কালে তোমাকে একটা কথা লিখি। হয়তো ভাবিতে পার, ধনী দিগম্বরের উপর অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে কেন আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। জান তো বন্ধু, বাংলাতে একটা প্রবাদ আছে—"ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলেই ভয় পায়"। আজ আমার ঠিক সেই দশা। এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া মহাদেব ও দিগম্বর উভয়ে মহাভারতের অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মত আমার জীবনে "খাণ্ডবদাহ" করিয়াছে। বন্ধু, জান না, সেই দাহের অন্তিমকালে এক মহাপুরুষের নাম আবিষ্কার করিয়াছিলাম। ইহা পৃথিবীতে অন্য কোন আবিষ্কার হইতে এক বিন্দু কম নয়। সেই নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমার দুঃখ-যন্ত্রণার অর্দ্ধেক কমিয়া গেল। বিদ্যাসাগর, করুণাসাগর, আহা কি প্রাণ জুড়ানো নাম! আজ আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি যে, আমার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার জন্য এক বিশাল বলশালী করুণাময় হৃদয় এখান হইতে সুদূর কলিকাতা শহরে মাতৃস্নেহে সর্বদা শঙ্কিত অবস্থায় জাগ্রত রহিয়াছে। আজ হইতে আমি নিশ্চিন্ত। আজ আমি সত্যই সুখী, বন্ধু। বিদায়।"

"বন্ধু,

আশা করি, এত দিনে আমার সকল চিঠিই পাইয়াছ এবং আমার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছ। অক্টোবর মাসে আমাকে আইন পাঠ শেষ করিবার জন্য ইংলণ্ড যাইতে হইবে। সেজন্য বহু টাকার প্রয়োজন, দিগম্বরকেও লিখিয়াছি, বোধ হয় তোমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। মহাদেবের নিকট যত টাকা পাওনা সাব্যস্ত হয়, সব আদায় করিয়া লইবে।

তুমি হয়তো শুনিয়া সুখী হইবে যে, সত্যেন এবারে আই, সি, এস, পরীক্ষায় পাস করিয়াছে, এবং সে কিছুদিনের মধ্যেই দেশে ফিরিবে। বেচারা মনোমোহন! আবার সে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে—আমার মনে হয় না যে, সে পাস করিতে পারিবে। প্রথমে আমার ধারণা ছিল—সত্যেন ঠাকুরের চেয়ে মনোমোহন ভাল ছেলে, কিন্তু এখন দেখিতেছি—আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।"

"হে বন্ধু,

জানি, এখনও তোমার উত্তর পাইবার সময় হয় নাই। কিন্তু তবুও আবার আজ তোমাকে আর একখানা চিঠি লিখিতে বসিয়াছি। তোমাকে যে বার বার পত্রাঘাত

করিয়া করিয়া বিরক্ত করিতেছি. আশা করি, সেজন্য তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবে না। আমার মানসিক অবস্থা কি, তোমার অজ্ঞাত নাই। বিদেশে স্ত্রী-সন্তানে পরিবৃত অবস্থায় অর্থহীন না হইলে কেহ আমার অবস্থা বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু তোমাকে সেই 'কেহ'র মধ্যে ধরি না এবং সেইজন্যই পর পর তোমাকে বিরক্ত করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। কুচক্রী মহাদেব চাটুজ্জের দলে বৈদ্যনাথ মিত্র নিশ্চয়ই যোগ দিয়াছে, তাহা আমি এখানে বসিয়া বুঝিতেছি। কিন্তু দিগম্বর? না, দিগম্বরকে তো অত নীচ বলিয়া জানিতাম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে কখনও ঐ চক্রান্তে যোগ দেয় নাই। দিগম্বর সেই আট শত টাকার সহিত যে পত্রখানা লিখিয়াছিল, তাহাতে ছিল—শীঘ্রই এক মাসের মধ্যে আরও হাজার টাকা পাঠাইতেছে। দিনে দিনে বহুদিন অতীত হইল, কিন্তু আর কোন সংবাদ বা টাকা পাইলাম না। আবার আমি ধীরে ধীরে দেনায় ডুবিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই তাহাদের ব্যবহার, এই তাহাদের টাকা পাঠানোর ধরণ! যেন নিজের টাকা—তাহারা আমাকে পাঠাইতেছে। সম্ভবতঃ এখন দুই চারি মাস তাহারা আর কোন পত্র দিবে না। এখানে আমার ১২।১৮ শত টাকা দেনা দাড়াইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে বৈদ্যনাথ আমাকে লিখে যে, আলিপুর কোর্টে আমার ১০০০৲ হাজার টাকা ডিপজিট রহিয়াছে। আমি তাহাকে তখনই ঐ টাকা অতি শীঘ্র পাঠাইয়া দিতে লিখি। কিন্তু, হায়, এই আগস্ট মাস আসিল—এ পর্যন্ত না টাকা, না তাহার একখানা উত্তর, কিছুই পাইলাম না। খিদিরপুরে হরি বাঁড়ুয্যের নিকট আমার পাচ শত টাকা পাওনা, কিন্তু কিছুই দিল না। দেখ, বন্ধু, আমার প্রতি বন্ধুবর্গের ব্যবহার! তাহারা হয়তো মনে মনে ঠিক করিয়াছে যে, অনাহারে বিদেশে আমার যদি মৃত্যু হয়, তবে ঐ সব দেনা হইতে তাহারা বাচিয়া যাইবে। বিদ্যাসাগর, তুমি আমাদের প্রাণ রক্ষা করিও—যেন এই সব ব্যবহারের প্রতীকারের জন্য আবার তাহাদের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস করুণাসাগরের নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইব না। কেহ কোন দিন তোমার নিকট সাহায্য না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, ইহা কি কেহ শুনিয়াছে? কিন্তু বন্ধু, অসম্ভবও সম্ভব হয়। যদি তোমার নিকটও সাহায্য না পাই, তবে—তবে কি করিব জান? যে প্রকারেই হউক দেশে ফিরিব, এবং ঐ দুইটি লোককে স্বেচ্ছায় সুনিশ্চিত খুন করিয়া নিজেও ফাসিকাষ্ঠে ঝুলিব।

ইহা হইতেই আমার মানসিক অবস্থা তুমি বুঝিতে পারিবে। আর কোন পথ খোলা দেখি না—একমাত্র তুমি ভিন্ন। তাই তো বন্ধু, তোমার দুয়ারে বারে বারে আঘাত করিতেছি—জানি যে বিফল হইব না। শরীর মন খুবই খারাপ।"

"সুহৃদ্বরেষু,

আমি যে ভাবে তোমাকে চিঠির পর চিঠি লিখিতেছি—ভয় হয়, পাছে তুমি অসন্তুষ্ট হও। এ ছাড়া আর কি করিতে পারি! এবং অসময়ে তুমি ভিন্ন আর আমার দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? রাগ করিবে? কিন্তু আমি তোমার সে রাগকে ভয় করি না। যখন শয়তান মহাদেবের কুচক্রে পড়িয়া দৈন্যের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি, তখন একমাত্র করুণাসাগর ছাড়া আর ভরসা কোথায়? কে এমন নির্ব্বোধ আছে, আমার মত হীন অবস্থায় বিদ্যাসাগরের নিকট, বাংলার সেই দানশীল বিরাট পুরুষের নিকট, সাহায্যের জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা করিবে?

"আমি নির্ব্বোধ, নচেৎ কি দিগম্বরের ২০এ মে তারিখের স্তোকপত্র পড়িয়া তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতাম না! তাহা না হইলে আজ একটা প্রতিবিধান করিয়া উঠিতাম। তাহার চিঠির উপর নির্ভর করিয়া আরও বেশি দেনাতে এখানে ডুবিতেছি। আজ তোমাকে চিঠি লেখার টিকিটটি পর্য্যন্ত বন্ধকী দোকান হইতে ধার করিয়া তবে লিখিতেছি। বন্ধুদের নিকট হইতে কেহ কি কোন দিন এমন জঘন্য ব্যবহার পাইয়াছে? এখন আমি একমাত্র তোমার দয়ার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছি।

বোকা মনোমোহন এবারও ফেল করিয়াছে। আমার মনে হয়, গ্রীক ও লাটিন ভাষায় তাহার অধিকার কম থাকাতেই সে বার বার ফেল করিতেছে। তাহার অকৃতকার্য্যতা নিশ্চয়ই দেশের পরীক্ষার্থীদের দমাইয়া দিবে না। আমার ধারণা, দেশী যুবকদের ১২।১৪ বৎসর বয়সেই য়ুরোপে শিক্ষার জন্য পাঠানো উচিত, তাহাতে প্রাথমিক ইংরেজী শিক্ষাটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সেটা আমাদের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় মনে হয়।

মনোমোহনের জন্য আমি সত্যই খুব দুঃখিত। তাহাকে পত্র দিয়াছি যে, সে যেন আমার নিকট এখানে আসিয়া কিছুদিন থাকিয়া ইতালীয় ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করে।

তুমিও বন্ধু, যদি আমাদের পরিত্যাগ কর, তবে আর ফরাসী জেল ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নাই, ইহা নিশ্চয়ই জানিও। এখন ব্যারিস্টারির দুরাশা ত্যাগ করিয়া জেলের চিন্তা করিতে হয়।

আমার স্ত্রীর এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, নিশ্চয় তুমি এতদিন চুপ করিয়া বসিয়া নাই। তোমার প্রেরিত অর্থ ও পত্র আমাদের জন্য ভারতবর্ষ হইতে রওনা হইয়াছে, শীঘ্রই তাহা পাইব। যদি না পাঠাইয়া থাক, তবে পাঠাইতে কালমাত্র বিলম্ব করিও না। কারণ, এখন আমাদের চারিটি হতভাগ্যের জীবন-মরণ তোমার হাতে নির্ভর করিতেছে।

তোমাকে একটা কথা জানাইয়া রাখি যে, ফরাসী দেশের পুলিশের ব্যবস্থা অতি কড়া ও তাহারা সুচতুর, তাই দেশে চোর-বাটপাড়ের উপদ্রব খুব কম। এখানে রেজেস্টারি চিঠিতে টাকা পাঠানো মোটেই আশঙ্কাজনক নয়।"

বিদ্যাসাগর বাঙালী ছিলেন না; বিদেশগত বন্ধুকে তিনি মনে রাখিতেন; তাঁহার সমবেদনা মৌখিক ও লজ্জা কেবল চাক্ষুষ ছিল না; কথা দিয়া কথা রক্ষা করিতেন; দানের প্রয়োজন বুঝিলে ঋণ করিয়া টাকা দিতেন; সুখের দিনে বন্ধুর বিপদ দেখিলে কাজের ছুতায় সরিয়া পড়িতেন না; গাছে তুলিয়া দিয়া মই টানিয়া লইবার অভ্যাস তাঁহার ছিল না; এক কথায় তিনি বাঙালী ছিলেন না।

মধুসূদনের চিঠি পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ঋণ করিয়া টাকা পাঠাইলেন; তিনি ইচ্ছা করিলে অতি সহজে পত্তনিদারের কাছে পাওনা টাকা আদায় করিবার উপলক্ষ্যে বিলম্ব করিতে পারিতেন এবং যখন সে টাকা ফ্রান্সে গিয়ে পৌঁছিত, অন্য প্রয়োজনে না হউক, মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি-সংকারে তাহার সার্থকতা হইত। বিদ্যাসাগরের ঋণ করা টাকা হাতে পৌঁছিয়া তাঁহাদের আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিল।

মধুসূদনের জীবন-ধনুকের দুই কোটি; এক কোটিতে সাহিত্য, অন্য কোটিতে সম্পদ; তাঁহার ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল, একসঙ্গে, এক জীবনে, এই দুই কোটিতে তিনি গুণ পরাইবেন; এমন প্রতিজ্ঞা করে অনেকেই; কিন্তু রক্ষা করিতে পারে কয়জনে? মধুসূদনও পারেন নাই।

সাহিত্য-কোটিতে গুণ পরানো হইয়াছিল; মধুসূদনের সাহিত্যজীবন প্রকৃতপক্ষে শেষ হইয়া গিয়াছিল। এবার অর্থের কোটিতে গুণ পরাইবার পালা। তাঁহার দানবীয় শক্তি ধনুকখানাকে নত করিয়া ধরিল; বিশাল ধনুক আর্তনাদ করিয়া উঠিল এবং অবশেষে বলের প্রবলতায় সে ধনুক ভাঙিয়া পড়িল—ইহাই মধুসূদনের জীবনের ট্র্যাজেডি।

কিন্তু কবি নিজে জানিতেন না যে, তাঁহার কাব্য-জীবন সমাপ্ত; তিনি তখনও বিরাটতর কাব্য লিখিবার উপাদান সংগ্রহে ব্যস্ত। কিন্তু যে শনি মানুষের সুখ-দুঃখে ছক-কাটা বিচিত্র জীবন-শতরঞ্জের উপর দ্যূতক্রীড়ায় মগ্ন তাহার ওষ্ঠাধরের স্মিত ব্যঙ্গ কে দেখিতে পায়?

মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে লিখিতেছেন—

"উদ্বেগের মধ্যে আছি, তবু ফরাসী ভাষা প্রায় আয়ত্ত করিয়া আনিয়াছি। ফরাসী ভাষায় বেশ কথাবার্তা বলিতে পারি, লিখিতে পারি আরও ভাল। ইটালীয়

ভাষা শিখিতে শুরু করিয়াছি এবং ফিরিবার পূর্ব্বে স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজ ভাষা না পারিলেও জার্মান নিশ্চয় শিখিয়া লইব।"

আবার--

"তুমি কল্পনাই করিতে পারিবে না, ইটালীয় ভাষায় কত চমৎকার কাব্য আছে! টাসোকে ইউরোপের কালিদাস বলা চলে।

আমি সত্যেন্দ্রকে [ঠাকুর] সেদিন ইটালীয় ভাষায় একখানা চিঠি লিখিয়াছিলাম—সে তার উত্তর দিয়াছিল ইংরেজীতে। কেন, বুঝিতে পারিলাম না। গত বছর সে তো খানিকটা ইটালীয় শিখিয়াছিল।"

এসব চিঠি কি আসন্ন-অনাহার-পীড়িত ব্যক্তির? নিন্দুকে বলিতে পারে, বিদ্যাসাগরকে খুশি করিয়া বিপদের দিনে টাকা আদায় করিবার জন্য, সন্দিগ্ধ পিতার কাছে অপবাদ রটিয়াছে যাহার নামে এমন পুত্রের, ভাল ছেলের ভান। দেশে মধুসূদনের নিন্দুকের অভাব ছিল না, তাহারা কল্পনার ব্যোমজানী পরগাছায় অতিরঞ্জনের ফল ফটাইয়া তাহাকে ফরাসী দেশের কারাগারে প্রেরণ করিয়াছিল।

কিন্তু আসল কথা অন্য রকম। মধুসূদন মনে মনে তখন ধনুকের দুই কোটিতে গুণ পরাইতেছিলেন; তাই এক দিকে কাব্যের উপাদান সঞ্চয় বিদেশী ভাষা হইতে, আর এক দিকে কবিজনোচিত জীবনযাপনের জন্য অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা ব্যারিস্টারি ব্যবসায় শিখিয়া লইয়া।

এ সময়ে তিনি দুইখানি বাংলা কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কাব্যের এই অর্দ্ধপথে ছেদ, অর্থাভাবে বা মনঃকষ্টে নয়; কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পরে গাণ্ডীবীর আর গাণ্ডীব উত্তোলন করিবার সামর্থ্য ছিল না। কাব্য-কোটিতে গুণ পরাইবার পর সাধ্য কি যে কবি আর নূতন কাব্য লিখিতে পারেন?

দ্রৌপদী-স্বয়ংবরে কবি আরম্ভ করিতেছেন—

> "কেমনে রথীন্দ্র পার্থ—পরাভবি রণে
> লক্ষ রণসিংহ শূরে পাঞ্চাল নগরে
> লভিলা দ্রুপদবালা কৃষ্ণা মহাধনে,
> দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধি দেববরে,
> গাইব সে মহাগীতি!"

সুভদ্রা-হরণ কাব্যের প্রারম্ভে আছে—

> "কেমনে ফাল্গুনী শূর স্বগুণে লভিলা
> পরাভবি যদুবৃন্দে চারুচন্দ্রাননা

ভদ্রায়, নবীন ছন্দে সে মহা কাহিনী—
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে।"

দুই কাব্যেরই মূল কথা এক; প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পার্থের জয় ও অভীষ্ট-লাভ। ইহা কি কবির নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়? তিনিও তো বিদেশে প্রতিকূলভাবে চরমে অভীষ্ট-লাভের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। তাহার লক্ষ্য যে লক্ষ্মী, তিনি দ্রৌপদী ও সুভদ্রার চেয়ে অনেক বেশি চঞ্চলা; যে লীলা গভীরভাবে তাঁহার জীবনে চলিতেছিল, কাব্যে তাহা অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

এই সময় ভার্সাই নগরের রাজকীয় উদ্যানে প্রায়ই মধুসূদন বেড়াইতে যাইতেন। এই ঐতিহাসিক স্থানে কবির মনে কি ভাবের উদয় হইত জানা যায় না। কিন্তু আর একটি ঐতিহাসিক দৃশ্যে তাঁহার মনের ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে পরিচয় পাওয়া যায়।

একদিন প্যারিসের পথে তৃতীয় নেপোলিয়ান ও সম্রাজ্ঞীকে দেখিয়া তিনি ফরাসী ভাষায় 'সম্রাট জীবতু' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, সম্রাটদম্পতী আনন্দে প্রত্যভিবাদন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে দান্তের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ইউরোপের কবিরা কবিতা লিখিয়া ইটালীতে পাঠাইতেছিলেন; মধুসূদনও একটি বাংলা সনেট ও তাহার স্বকৃত ফরাসী ও ইটালীয় অনুবাদ পাঠাইয়াছিলেন। ইটালীরাজ ভিক্টর ইমানুয়েল এই কবিতা পাইয়া মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন—"আপনার কবিতা রাখীবন্ধনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে যুক্ত করিবে।"

মধুসূদনও জানিতেন না, ইটালীরাজও জানিতেন না, যাহার কবিতা সত্যই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যকে সংযুক্ত করিবে, তিনি অতি দূরে, পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে কোনও শিশুশয্যায় সেদিন নিদ্রিত।

মধুসূদনের জীবনীকার লিখিতেছেন—কবি ইউরোপে থাকিবার সময়ে ভিক্টর হুগো ও টেনিসনের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন।

মধুসূদনের মত ইতিহাস-সচেতনতা বোধ হয় কোন বাঙালী লেখকের ছিল না; চতুর্দশ লুই-এর উদ্যান, নেপোলিয়ানের বংশধর, দান্তের কবিস্মৃতি, ভিক্টর হুগো ও টেনিসনের সঙ্গ—ইতিহাসের কোন্ বিস্মৃত বীথিকার মধ্যে তাঁহার মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিত! জীবনের এক কোটিতে ইতিহাসের জ্যোতিষ্পাত, আর এক কোটিতে অসহায় ভীত দারিদ্র্য—"এই চিঠি লিখিবার ডাকটিকিট জিনিস বন্ধক দিয়া কিনিতে হইয়াছে।" মানুষের জীবনের মহত্ত্ব ও তুচ্ছতা হরগৌরীর মত একাঙ্গ। মনোমোহন ঘোষ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ফেল করিলে বিদ্যাসাগরকে দুঃখ করিয়া মধুসূদন লিখিতেছেন—

"বেচারা মনু আবার ফেল করিয়াছে।...আমার বিশ্বাস মনুকে এখন ব্যারিস্টারি পড়িতে হইবে, কিন্তু সমস্যা এই যে, সে পরীক্ষাতেও পাস হইবার শক্তি কি তাহার আছে? ইংরেজ জুরির সমক্ষে বহুঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা করিবার মত ইংরেজী-জ্ঞান কি তাহার হইয়াছে?"

অদৃষ্টের ইহাও একটা দারুণ পরিহাস। যে মনুর ইংরেজী-জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ, যে মনুর পাস করিবার সামর্থ্য সম্বন্ধে দ্বিধা, একদিন, জীবনের শেষ দিনে, আত্মপ্রত্যয়ী মধুসূদনকে এই বেচারা মনুর হাতেই নিজের অনাথ শিশু দুইটিকে তুলিয়া দিয়া বিদায় লইতে হইয়াছিল!

* * * *

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত অর্থে মধুসূদনের সচ্ছলতা ঘটিল, তিনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন।

ইংলণ্ডে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত গোল্ডস্টুকরের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়; মধুসূদনের পাণ্ডিত্যে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে বাংলা অধ্যাপকের পদ তাঁহাকে দিতে চাহিলেন; পদটি অবৈতনিক। বলা বাহুল্য, এই অবৈতনিক পদ তিনি গ্রহণ করেন নাই।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর মধুসূদন ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁহার দূর হয় নাই, বিদ্যাসাগরের অনুগ্রহে কোন রকমে কায়ক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদন চলিতেছিল মাত্র। বিদ্যাসাগরকে লিখিত একখানি চিঠিতে আছে—

"আমার স্ত্রীকে প্রায়ই বলিয়া থাকি, কলিকাতায় ফিরিয়া গেলে তোমার বাড়িতে আমাদিগকে থাকিবার জন্য একখানি ঘর ও জীবনধারণের উপযোগী প্রচুর পরিমাণে অন্ন দিবে।"

গৌরদাসকে লিখিতেছেন—

"আমাদের বাংলা অতি সুন্দর ভাষা; প্রতিভাবানের হাতে পড়িলে ইহার উজ্জ্বলতা বাড়িবে। আমাদের শৈশবের শিক্ষার ত্রুটির জন্য এ ভাষা শিখি নাই। বাংলার মধ্যে মহাভাষার উপাদান আছে। আমার সাধ হয় যে, মাতৃভাষার চর্চ্চায় জীবন নিয়োগ করি; কিন্তু সাহিত্যিকের জীবন যাপন করিতে হইলে যে পরিমাণ টাকা দরকার, আমার তাহা নাই। আমাদের দেশে টাকা না হইলে সম্মান নাই। যদি টাকা থাকে তুমি বড়মানুষ, নতুবা তোমাকে কেহ গ্রাহ্য করিবে না। আমরা নিতান্ত অধঃপতিত জাতি। আমাদের দেশের বড় লোকেরা কে? চোরবাগানের ও বড়বাজারের নামগোত্রহীনের দল।"

এখানে দেখি, কবির জীবনের দুই কোটির মধ্যে দ্বন্দ্ব। সাহিত্য ও অর্থ; ইহজীবন ও অমরত্ব, আরাম ও খ্যাতি। যে ভাবে চিঠিখানা লিখিত, তাহাতে যেন অর্থের জয়েরই আভাস। বোঝা যায়, কবির জীবন যবনিকার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

অবশেষে ইউরোপ হইতে বিদায়ের দিন আসিল। বিদ্যাসাগরের নিষেধ না মানিয়া পত্নী ও পুত্রকন্যাদের ফরাসী দেশে রাখিয়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের রই জানুয়ারি মাসাই বন্দরে তিনি জাহাজে চড়িলেন। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা সাশ্রুনয়নে বন্দরে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মধুসূদন ইউরোপের ভূমি ত্যাগ করিলেন।

* * *

এত আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও মাইকেল বিদেশে গিয়া বড় কোন কাব্য লিখিতে পারিলেন না কেন? অবস্থার প্রতিকূলতা, অস্বাস্থ্য, ঋণ? ইহা আর সাধারণের পক্ষেই সত্য হউক, মাইকেলের মত দৈত্যশিশু, যাহার মন্ত্র "শরীরং পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ং", তাহার পক্ষে সত্য নয়। তিনি যে শুধু বড় কাব্য লিখিতে পারেন নাই তাহা নয়, অনেকগুলি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

তাহার জীবনীকার বলেন—"সীতা কাব্য ভিন্ন কতকগুলি ইংরেজী খণ্ড কবিতাও তিনি ইউরোপ-প্রবাসকালে রচনা করিয়াছিলেন, —ইহার কোনটাই সমাপ্ত হয় নাই।"

আমার মনে হয়, তাহার অবস্থা প্রতিকূল না হইয়া অনুকূল হইলেও তিনি আর দীর্ঘ কাব্য রচনা করিতে পারিতেন না। দেশে ফিরিয়া প্রথম দুই বৎসর সাংসারিক অবস্থা বেশ ভালই ছিল; সে সচ্ছলতা তাহার ভাগ্যে আর ঘটে নাই। কিন্তু সে সময়ে তাহার উল্লেখযোগ্য রচনা কি? কিছুই নয়। কেন এমন ঘটিল?

উচ্চ শ্রেণীর কাব্য রচনার পক্ষে মানসিক একটা সংযম আবশ্যক। নৈতিক সংযমের কথা বলিতেছি না। মনোবৃত্তি, দেহবৃত্তি, সাংসারিক প্রবৃত্তি কায়মনোবাক্যে একটি কেন্দ্রে আসিয়া একীভূত হইলে তবেই বড় কাব্য রচনার অনুকূল অবস্থা ঘটে। ইহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পক্ষে এমন একটি অতিশয় শ্রমসাধ্য ব্যাপার যে, এমন অনুগ্রহের সংযোগ কদাচিৎ ঘটে, এবং ঘটিলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ইহা ব্যক্তিগত ও জাতিগত উভয় জীবন সম্বন্ধেই সত্য। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছুকাল পরে এমন একটি গানের গোধূলি-লগ্ন আসিয়াছিল, সেই দেশব্যাপী শুভলগ্নে বাঙালী কবি কথা বলিলেই সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিত। এল্‌ডোরাডোর পথে ছেলেরা সোনার গুলি লইয়া খেলা করে; আর সেদিন বাঙালী কবিরা অজস্রধারে পদাবলীর সাহায্যে হরির লুট দিয়াছেন। কিন্তু সে কোটালের বন্যা চলিয়া গেল, বাঙালী কবিরা আবার পল্লীমাতার গোয়ালে ফিরিয়া ছড়া আর ভাবনা কাটিতে আরম্ভ করিল।

বিদেশের সাহিত্যে ইহার তুল্য উদাহরণ বিরল নহে। মহাকবি গ্যেটের জীবন দেখা যাক। বৈজ্ঞানিক গ্যেটে ও শিল্পী গ্যেটে; এক দিকে তিনি সভাসদ ও মন্ত্রী, অন্য দিকে তিনি কবি ও ঋষি; এই দ্বিধ তাঁহার কাব্যকে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে দুষ্টির শুভলগ্ন আসিয়াছে, তখন অমর কাব্যের অজস্র বর্ষণ। আবার সেই দ্বিধা; তাঁহার অনেক অসমাপ্ত কাব্যে এই জীবনব্যাপী দ্বিধার চিহ্ন।

মাইকেলের জীবনেও এমন একটি দুর্লভ অবসর আসিয়াছিল; মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে ও বিলাতগমনের পূর্ব্বে স্বল্পস্থায়ী চার-পাঁচটি বৎসর। যে প্রধান আকাঙ্ক্ষাকে তিনি শৈশব হইতে আশ্রয় করিয়াছিলেন, শেষে যে আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অস্তিত্বের সহিত অবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহারই চরম পরিণামে মধুসূদন যেন নিজের অস্তিত্বের পরিণাম লাভ করিয়াছিলেন। মহাকাব্য রচনার এই আকাঙ্ক্ষার নাম ছিল—মধুসূদন, তাহা যখন চরিতার্থতা লাভ করিল, তখন সেই সঙ্গে মধুসূদনেরও নির্ব্বাণ-লাভ ঘটিল। অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষাই প্রেতের মত রূপ পরিগ্রহ করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সময় মহাকাব্য রচনার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার তৃপ্ত হইয়াছিল; বাকি যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ইংলণ্ডগমনের, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার আর কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ মহাকাব্য তিনি দেশে বসিয়াই রচনা করিয়াছিলেন, সেই অতৃপ্ত অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। অবশেষে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে—সুদূরে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, মধুসূদনের কবিপ্রকৃতি বিদেশে গিয়া হতাশ হইয়াছিল। কাব্যরচনার পূর্ব্বে তিনি বিদেশে গেলে এমন হতাশ হইতেন না। সেখানে গিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণ-বিরহিত পার্থের মত গাণ্ডীবখানা তুলিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাঁহার নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানসিক একটা বিশেষ লগ্ন অতিক্রম করিবার দরুন মাইকেলের কাব্য-গঠনের শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু কবিত্ব-শক্তির অভাব ঘটে নাই। কবিত্ব-শক্তি এক পদার্থ, কিন্তু সেই শক্তির সাহায্যে বড় একটা কাব্য গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা স্বতন্ত্র; ইহাকে কাব্যের স্থাপত্যশিল্প বলা যাইতে পারে। মাইকেল কবি ছিলেন, কিন্তু তাহার চেয়েও বড় কথা, মাইকেল ছিলেন কবি-স্থপতি। বিলাতগমনের পরে মানসিক অরাজকতায় এই শক্তিই তাঁহার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কবিত্ব-শক্তি যে অব্যাহত ছিল, তাহার প্রমাণ 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেটকার ও অদ্যাবধি প্রধান সনেটকার।

অট্টালিকা ও ইটের মধ্যে যে সম্বন্ধ, ঠিক সেই সম্বন্ধ তাঁহার অলিখিত কাব্য ও এই সনেটগুলির মধ্যে। এই ইটের সৌন্দর্য্য ও দৃঢ়পিনদ্ধ গঠন দেখিলে দুঃখ হয়, ইহাতে অট্টালিকা গঠিত হইলে কি অমর কীর্ত্তিই না নির্ম্মিত হইত! কিন্তু কারিগরের

সেই সমগ্রতার দৃষ্টি, সমগ্রতার বোধ আর ছিল না; ইট গড়িবার শক্তি থাকিলেও তাহাকে অট্টালিকার অখণ্ডতা দানের শক্তি তাহার লোপ পাইয়াছিল। সনেটগুলির আলোচনা করিলে আশা করি আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

মাইকেলের সনেট নিম্নলিখিতরূপে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অনুসারে চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। [ক] কবি ও কবিখ্যাতি, [খ] পৌরাণিকী, [গ] দেশের স্মৃতি, [ঘ] বিবিধ।

এই বিভাগে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। দেশী বিদেশী অনেক কবির বিষয়ে তিনি সনেট লিখিয়াছেন, কিন্তু যাহারা তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল, বিদেশী যে সব কবির নিকট তিনি সমূহ ঋণী, সেই হোমার, ভার্জিল, টাসো, ওভিড্-এর কোন উল্লেখ নাই।

যে মিল্টন তাহার কবির আদর্শ, যে বায়রনের জীবনী পড়িয়া তাহার মনে হইত, তিনিও বড় কবি হইবেন, ইংলণ্ড-গমন যাহাদের দেশে গমনের নামান্তর মাত্র, তাহাদেরও কোন উল্লেখ নাই। বিদেশ হইতে লিখিত চিঠিপত্রে মিল্টনের কথা দৃষ্ট হয় না।

সাহিত্য জীবন নয়, জীবনের ছায়াও নয়; সাহিত্য না-জীবন। সাহিত্য ও জীবন পরস্পর পরিপূরক। জীবনে যে আশা সফল হয় না, সাহিত্যের কল্পতরুতে তাহাই ফল প্রসব করে। দেশে থাকিতে এই সব বিদেশী কবিদের স্পর্শ তাহার কাব্যসৃষ্টির সার্থকতায় চরম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিল। এই সব কবিদের সফলীভূত আকাঙ্ক্ষা আর কাব্যের সামগ্রী ছিল না। কিন্তু কবিখ্যাতির আশা তাহার মেটে নাই বলিয়া সে সম্বন্ধে অনেকগুলি সনেট আছে। অবশ্য দান্তের বিষয়ে একটি সনেট আছে, কিন্তু দান্তের অপেক্ষা ইহা তাঁহার জন্ম-তিথি উপলক্ষ্যে রচিত বলা উচিত। এই সনেটটিই অনুবাদ করিয়া কবি ইটালীরাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এই প্রেরণের মধ্যে যেন একটি চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা আছে। এই চেষ্টা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমরা বলিয়াছি, তাঁহার মধ্যে একটি 'স্নব' বরাবর প্রচ্ছন্ন ছিল। যে মনোবৃত্তিতে তিনি এক মোহর খরচে চুল ছাঁটিয়া গর্ব করিতেন, চল্লিশ হাজার টাকার কমে ভদ্রলোকের চলা উচিত নয় মনে করিতেন, রাজমোহন দত্তের পুত্র গুনিয়া টাকা দান করে না বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন, ফরাসী-সম্রাট লুই-নেপোলিয়ানকে দেখিয়া 'সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন' বলিয়া ফরাসী ভাষায় চীৎকার

করিয়া উঠিতেন, সেই মনোবৃত্তিতে তাহার এ সনেট প্রেরণ—দান্তের উৎসব উপলক্ষ্যে—ইটালীরাজের নিকটে।

এই প্রেরণার মূলে কবি-মধুসূদন নহে, স্বর-মাইকেল—রাজমোহন দত্তের পুত্র। যে চোরবাগানের নগণ্যদের তিনি অবজ্ঞা করিতেন, এখানে তিনি তাহাদের সগোত্র। জীবিত কবিদের মধ্যে টেনিসন, ভিক্টর হ্যুগোর বিষয়ে দুইটি সনেট আছে। একজন রাজকবি, অন্যজন তৎকালীন ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত। এ দুইটি কবিতা ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়া যথাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল কি না, না জানা পর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যেও যে এমন একটি সুদূর ব্যঞ্জনা নাই, তাহা বলা যায় না।

দেশীয় কবিদের মধ্যে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, জয়দেব, কৃত্তিবাস আছেন। মাইকেল দেশে ফিরিয়া বড়দরের কাব্য লিখিবার আত্যান্তিক সুযোগ পাইলে কি রকম কাব্য লিখিতেন, কেহ বলিতে পারে না। এই সব অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষা—কবির নাম দেখিয়া মনে হয়, তাহার কাব্যশিল্প অধিকতরভাবে ভারতীয় রূপ গ্রহণ করিত। একদা যেমন তিনি ভারতীয় ভাষায় লিখিবার জন্য ইংরেজী ভাষা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তেমনই সুযোগ পাইলে কাব্যকে অধিকতর ভারতীয় রূপ দিবার জন্য পূর্ব্বাচরিত কাব্যের পন্থা, খুব সম্ভব, তিনি ত্যাগ করিতেন। তাহার যে কাব্য আমরা পাইয়াছি, তাহা শিক্ষানবিসী পর্ব্বের রচনা; মাইকেলের প্রকৃত কাব্য অরচিত রহিয়া গিয়াছে।

[খ]

মধুসূদন নবতর উদ্যমে কাব্য-রচনার সুযোগ পাইলে, সে কাব্য যে পৌরাণিক ভিত্তিতে গঠিত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অসমাপ্ত গীতির খণ্ডিত তান ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পৌরাণিক সনেটগুলির সৃষ্টি করিয়াছে।

মধুসূদন অনেকগুলি পৌরানিক কাব্য অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন; সুভদ্রাহরণ, দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর, সীতাকাব্য, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র অসমাপ্ত কয়েকখানি পত্রিকা; ইহা ছাড়া, 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র একটি নূতন সংস্করণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল।

এই অংশের সনেটগুলিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা চলে। রামায়ণ মহাভারত, অর্থাৎ ভারতীয় পুরাণের কাহিনী লইয়া তিনি কয়খানি সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ব্রজবৃত্তান্ত বিষয়ে তাঁহার রচনা 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'। কিন্তু বাংলা পুরাণ লইয়া তিনি কোন কাব্য রচনা করেন নাই।

কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, ঈশ্বরী পাটনী, শ্রীমন্তের টোপর সনেট এবং অসমাপ্ত

সিংহল-বিজয় কাব্য তাঁহার মনোজগতে নূতন দিগ্দর্শন সূচনা করে। আমরা আগে বলিয়াছি, তাঁহার পক্ষে বড় কাব্য রচনা সম্ভব হইলে তাহা অধিকতরভাবে ভারতীয় রূপ গ্রহণ করিত। এখন এই সনেটগুলি দেখিয়া মনে হয়, খুব সম্ভব, সে কাব্যের বিষয়বস্তু বাংলা পুরাণ হইতে সংগৃহীত হইত।

বাংলা কোন্ পুরাণের ঘটনা অবলম্বনে সে কাব্য লিখিত হইত? উপরের কবিতাগুলি হইতে তিনটি বিষয়বস্তুর নির্দেশ পাওয়া যায়; অন্নদামঙ্গল, ধনপতি সদাগরের কাহিনী ও বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয়। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'ও একবার তিনি লঙ্কা বা সিংহল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, সিংহলের প্রতি মাইকেলের একটা অন্ধ আকর্ষণ ছিল। ইহা কি একেবারেই অকারণ?

সমুদ্রপারবর্তী ঐশ্বর্যময় ক্ষুদ্র সিংহল দ্বীপ কি তাঁহার মগ্ন চৈতন্যলোকে সমুদ্রপারবর্তী সম্পদের লীলাভূমি আর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের কোন অনুরণন ধ্বনিত করিত না? কে বলিতে পারে? সম্ভবত তিনি ধনপতি সদাগরের সিংহলযাত্রা কিংবা বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয় বৃত্তান্ত লইয়া কাব্য রচনা করিতেন; এ ক্ষেত্রে সমুদ্র ও সিংহল তাঁহার কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিত।

তিনি নিজেই কি ধনপতি সদাগর নন—যিনি দুস্তর জলধি অতিক্রম করিয়া সিংহলের অভিমুখে চলিয়াছেন? না, ধনপতির অপেক্ষা কঠিনতর তাঁহার ব্রত; তিনি একাধারে বাস্তব সমুদ্র ও মানস সমুদ্র ভেদ করিয়া চলিয়াছেন, যাহার পরপারে সিংহল ও ইংলণ্ড মিশিয়া গিয়া এক নবতর রহস্যলোকের সৃষ্টি করিয়াছে। এই দুস্তর-জল-মরুবাসিনী কমলে কামিনী তাঁহার কাছে কেবল লক্ষ্মী নয়, সে যুগপৎ লক্ষ্মী ও সরস্বতী; এই যুগলের যোগানন্দ-সাধনাই যে তাঁহার জীবনের দুশ্চর ব্রত।

আবার অন্নদামঙ্গল-কাহিনী লইয়াও কাব্য-রচনা অসম্ভব ছিল না। পূর্ব্বগামী বঙ্গীয় কবিদের মধ্যে এক ভারতচন্দ্রকেই তিনি স্বজাতিরূপ মনে করিতেন। কীর্ত্তিবাস কাশীদাস বড়, কিন্তু তাঁহারা ব্যাস বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া লোকোত্তর; তাঁহাদের সঙ্গে লৌকিক কবিদের তুলনা চলে না। লৌকিক কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্র শ্রেষ্ঠ। লোকেও তাঁহাকে ভারতচন্দ্রের সঙ্গেই তুলনা করিত। যিনি কালিদাসের সমকক্ষ হইবার আশা রাখিতেন, তাঁহার কাছে এ তুলনা মুখরোচক হয় নাই। ভারতচন্দ্রের স্মৃতি তাঁহাকে টানিত। সে টান ঈর্ষার নয়, কারণ মধুসূদন সাহিত্যে ও জীবনে ঈর্ষা কাহাকে বলে জানিতেন না। এই আকর্ষণকে সুস্থ ও অনুরূপ মনের প্রতিযোগিতার আহ্বান বলা যাইতে পারে। এ হেন ভারতচন্দ্রের কাব্যের বিষয়বস্তু লইয়া তিনি যে একখানি কাব্য লিখিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের এমন কি আছে?

[গ]

এই পর্য্যায়ের সনেটগুলির মূলে দেশের স্মৃতি। দেশে থাকিতে বিদেশ তাঁহাকে কিরূপে টানিয়াছিল তাহা দেখিয়াছি। বিদেশে গেলে অনেককেই দেশ টানিয়া থাকে, কিন্তু মাইকেল দেশে থাকিতেও খানিকটা পরিমাণে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। ধর্ম্মমতে তিনি খ্রীষ্টান; কিন্তু তাঁহার কাব্যবস্তু হিন্দু-ঐতিহ্য ও হিন্দু-জীবন; এই দুইটির মাঝে একটি বিচ্ছেদের অবকাশ। বিদেশে গিয়া এই বিচ্ছেদ বড় করুণভাবে তাঁহার চোখে পড়িয়াছে। এই দ্বিধার দ্বিত্ব, দেশ ও হিন্দু-জীবন তাঁহার অনেকগুলি সনেটকে বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। কপোতাক্ষ নদ, নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষের মূলে শিবমন্দির, নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশমন্দির প্রভৃতিতে বিচ্ছিন্ন দেশের স্মৃতি। আবার শ্রীপঞ্চমী, আশ্বিন মাস, বিজয়া দশমী, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতি সনেটে বিচ্ছিন্ন হিন্দু-জীবনের (যে হিন্দু-জীবন তাঁহার কাব্যের উপজীব্য) আকর্ষণ।

মাইকেল খ্রীষ্টান হইলেও তাঁহার কবিপ্রকৃতি প্রকৃত কাব্য সামগ্রীর দিকে তাঁহাকে সবলে টানিয়া রাখিয়াছে; সেইজন্য নানা বাধা সত্ত্বেও তাঁহাকে কখনও কাব্য-সামগ্রীর অভাবে বা ভুলে দ্বিধাগ্রস্ত হইতে দেখা যায় নাই। শিল্পী-মধুসূদন মানুষ-মধুসূদনকে চালনা করিয়াছেন।

[ঘ]

বিবিধ পর্য্যায়ের সনেটগুলির মধ্যে দুইটি, ভারতভূমি ও আমরা। এ দুইটি দেশপ্রেমের কবিতা, প্রাচীন ভারতের জন্য গৌরব, আধুনিক ভারতের জন্য দুঃখ, ভারতভূমির দুরবস্থার জন্য আক্ষেপ। অন্য কয়েকটি সনেটে কবির ব্যক্তিগত জীবনের নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার বিলাপ। তিনি বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে, বায়রনের অনুকরণে "রেখ মা দাসেরে মনে" বিখ্যাত কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। ইহার প্রারম্ভে বায়রনের **'My native land, good-night'** ছত্রটি উদ্ধৃত। মাইকেলের মধ্যে 'স্ববারি' ও নিষ্ঠা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। না, তাহার চেয়েও বেশি; তাঁহার আন্তরিক নিষ্ঠা এতই প্রবল যে, 'স্ববারি'তে যে ভাবের জন্ম, নিষ্ঠার প্রভাবে কবির অজ্ঞাতসারে তাহার প্রকাশ অসামান্যতা লাভ করিয়াছে। এই কবিতা ও আত্মবিলাপে যে আক্ষেপের সুর, এই সনেটগুলিতে তাহাই ধ্বনিত।

মাইকেলের জীবনে যে অসংযম ছিল, সাহিত্যে তাহার কোন চিহ্ন নাই। সেইজন্য তাঁহার কবি-প্রকৃতি এত বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়াও বাড়িতে পারিয়াছিল। তাঁহার সাংসারিক

জীবনে 'স্ববারি' প্রচুর ছিল, কিন্তু যে অন্তঃপুরে কবি-প্রকৃতি লালিত হয়, সেখানে এ সকলের প্রবেশ ছিল না। কখনও কখনও যে ইহারা দ্বারে আসিয়া অনধিকার-প্রবেশের চেষ্টা করে নাই তাহা নয়, তবে তাহা লক্ষ্মণ ও বিভীষণের মত ছদ্মবেশে আসিয়াছে। সেখানে তাঁহার কবি-প্রকৃতি আহুতযজ্ঞ মেঘনাদের মত অজেয়, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাদিগকে সবলে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছে। কাব্যের এই নিয়ম-শৃঙ্খলা মাইকেলের প্রতি সনেটে দৃষ্ট হয়। নিয়মের এই অমোঘতা পরবর্ত্তী কবিদের হাতে অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কোন রকমে চৌদ্দটা ছত্র জোড়া দিলেই আজকাল সনেট হয়। কিন্তু মাইকেল জীবনে যাহাই করুন, সাহিত্যে জোড়াতাড়ার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। সে হিসাবেও মাইকেলের কবি-জীবনের শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার হিসাবে এই সনেটগুলি বিশেষ মূল্যবান। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাহিত্য জীবন বা তাহার ছায়া নয়, সাহিত্য না-জীবন, অর্থাৎ জীবনে যাহা ঘটে না, সাহিত্যে তাহার ঘটনা। মাইকেলের জীবনে যে নিষ্ঠা ও নিয়মচর্য্যা-জাত শান্তি কাম্য ছিল, এই অমোঘশৃঙ্খলিত সনেটগুলিতে তাহাই রূপ পাইয়াছে।

সীতা-হরণ

"যত পারি তত টাকা রোজগার করিতে আমি ব্যস্ত।"
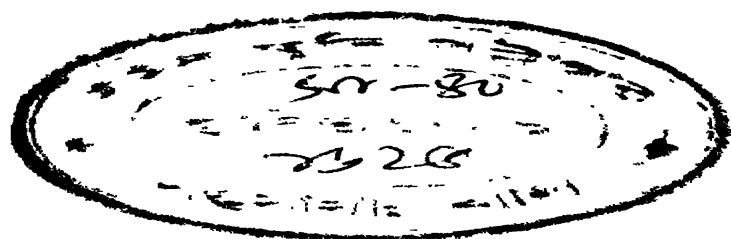
"যদি তোমার একমুষ্টি অন্ন জোটে—আমার সন্তানদের সঙ্গে ভাগ করিয়া খাইও।"
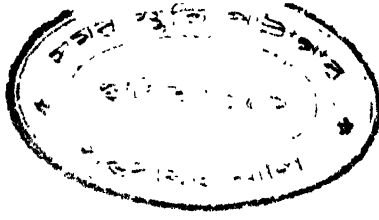
কলিকাতায় ফিরিয়া মাইকেল স্পেন্সেস হোটেলে উঠিলেন। মধুস্থদন ফিরিয়াছেন শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। বিদ্যাসাগরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই মাইকেল ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিলেন এবং বাধা দিবার আগেই তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া নৃত্যের তালে তালে সবেগে পাক খাইতে লাগিলেন। নাচের বেগে মাইকেলের দ্বিধাবিভক্ত দাড়ি ও বিদ্যাসাগরের উড়ুনি বাতাসে সঞ্চালিত হইতে লাগিল; মাইকেলের বুট খটখট ও বিদ্যাসাগরের চটি চটচট করিতে লাগিল; স্থূলকায় মাইকেল ও ক্ষুদ্রকায় বিদ্যাসাগর গ্রহসনাথ উপগ্রহের মত ঘরময় বনবন করিয়া পাক খাইতে থাকিলেন।

বিদ্যাসাগর যতই বলেন—আঃ, লাগে যে! মধুস্থদন ততই ঘন ঘন তাঁহার মুখচুম্বন করেন। বিদেশে বিপদের সময়ে যে ব্যক্তির কৃপায় রক্ষা হইয়াছিল, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া কি মধুস্থদনের শান্তি আছে? নিরুপায় বিদ্যাসাগর কৃতজ্ঞতার ঘূর্ণিপাকে আবর্ত্তিত হইতে লাগিলেন, আর আশঙ্কিত বন্ধুরা নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করিয়া কৃতজ্ঞতার পাশ্চাত্য ঘূর্ণিবাত্যা দেখিতে লাগিলেন।

অবশেষে উভয়ে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ জিরাইয়া লইয়া বিদ্যাসাগর বলিলেন, মধু, তোমার জন্য একখানি বাড়ি ভাড়া নিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি, সেখানে চল; এ হোটেলে বাস করা ব্যয়বহুল।

মাইকেল বলিলেন, মাই ডিয়ার ভিড্! (বিদ্যাসাগর শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন)—সেজন্য তুমি ভেবো না, আমি এখানে বেশ আছি।

বিদ্যাসাগর বুঝিলেন, মাইকেল এ হোটেল ছাড়িয়া দেশী পাড়ায় যাইবেন না, কাজেই অনুরোধ বৃথা। তিনি উঠিয়া পড়িলেন; মধুস্থদনও উঠিলেন এবং বিদায়ের

পূর্ব্বে বাংলার অদৃষ্ট-আকাশের যুগল জ্যোতিষ্কের সেই গ্রহনৃত্য আবার আরম্ভ হইল। কোন রকমে তাঁহার হাত ছাড়াইয়া বিদ্যাসাগর বাহির হইয়া পড়িলেন।

বন্ধুরা মধুসূদনকে "কোথায় উঠিয়াছেন" জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন বামুনপাড়ায় আছি। তাহারা না বুঝিলে ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন—গাঁয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাড়া বামুনপাড়া; শহরের মধ্যে সাহেব-পাড়া শ্রেষ্ঠ, কাজেই বামুনপাড়া।

মধুসূদন ইউরোপের দারুণ অনটনের স্মৃতি ইতিমধ্যেই ভুলিয়া গিয়াছেন; ভুলিয়া গিয়াছিলেন চিঠির সেই কয়েক ছত্র, যাহাতে তিনি সপরিবারে বাস করিবার জন্য একখানি মাত্র ঘর ও প্রাণধারণের জন্য প্রচুর অন্ন ছাড়া আর কিছু চাহেন না লিখিয়াছিলেন; মধুসূদনের শিশু-মনের উপরে দুঃখের অশ্রু হাঁসের পাখার জলের মত গড়াইয়া পড়িয়া যাইত।

তিনি বিদ্যাসাগরকে তাঁহার জন্য চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের চিন্তা দূর হইবে কেন? পরের জন্য কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে বিনা অনুরোধেও করিবে; পরের জন্য যাহার চিন্তা করা স্বভাব, সে চিন্তা না করিয়া পারে কই?

অতএব মধুসূদন আগামী আড়াই বছরের জন্য স্পেন্সেস হোটেলে রহিয়া গেলেন আর বিদ্যাসাগর যুগপৎ পুরাতন ঋণের সুদ ও নূতন ঋণের সন্ধানের জন্য আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

* * *

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ ফেব্রুয়ারি মাইকেল ব্যারিস্টাররূপে হাইকোর্টে প্রবেশের জন্য দরখাস্ত করিলেন। এটা কেবল গতানুগতিক প্রথা রক্ষার ব্যাপার, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে বিপরীত হইল। একজন জজ মন্তব্য করিলেন—"মাইকেলের চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ব্ব-ইতিহাস সুবিধাজনক নয়।" তখন অনন্যোপায় মধুসূদন তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস যে সুবিধাজনক, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সার্টিফিকেট সংগ্রহে লাগিয়া গেলেন।

কবি-মধুসূদন কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে কাহারও কাছে সার্টিফিকেটের অপেক্ষা রাখিতেন না, স্বহস্তে অমরতার মুকুট মাথায় পরিয়া বন্ধুদের বলিতেন, এ কাব্য কি আমাকে অমর করিবে না? কিন্তু সেই মধুসূদন কুবেরের সিংহদরজায় প্রবেশে বাধা পাইয়া, সরস্বতীর দরবারের মালা-চন্দনের খ্যাতি ভুলিয়া প্রশংসাপত্র যাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তাঁহার পূর্ব্ব-ইতিহাস কেন যে সুবিধাজনক নয়, জজেরা তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই; বোধ করি, মধুসূদনের সুরাপানের অখ্যাতি তাঁহাদের কানে উঠিয়াছিল। জজেদের দোষ দেওয়া যায় না, ব্যারিস্টার হইয়া সুরাপান দোষের নয়, কিন্তু ব্যারিস্টার

হইবার পূর্ব্বে একজন সাধারণ ব্যক্তি সুরাপান করিবে—এ স্পর্দ্ধা অসহ্য! পরিহাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া, জজেদের মন্তব্য বিশ্বাস করিতে হইলে ধরিয়া লইতে হইবে, কোন ব্যারিস্টার সুরাপান করে না; কাজেই মধুসূদনের চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত করিবার আদেশ হইল।

মধুসূদনের চরিত্র ও প্রতিভা সম্বন্ধে একগোছা প্রশংসাপত্র সংগৃহীত হইল। অবচেতন শ্লেষ বহিয়া সেগুলি আজিও তাহার জীবনীর মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। এসব প্রশংসাপত্র একটা কথা প্রমাণ করে যে, এই কয় বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে এই ধারাটার যেমন উন্নতি হইয়াছে, এমন আর কিছুর নয়। বাংলা প্রশংসাপত্র রচনার রীতি অতি-প্রশংসা ও অতি-নিন্দার মধ্যে দোল খাইতে খাইতে চলিয়াছে।

অবশেষে, এই সব প্রশংসাপত্রের বলে মাইকেল ২৫এ এপ্রিল হাইকোর্টে ব্যারিস্টাররূপে প্রবেশ করিলেন। মধুসূদন প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, তাহার পক্ষে বিলাত গিয়া ব্যারিস্টার হইয়া আসিয়া হাইকোর্টে প্রবেশ অসম্ভব নয়; কেবল আর একটি কথা প্রমাণের বাকি রহিল যে, ব্যারিস্টারি-ব্যবসায়ে উন্নতি করা তাহার মত লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহা প্রমাণ করিতে তাহার বেশি সময় লাগিল না।

* * *

হাকিমের এজলাসে আজ বড় ভিড়। হাকিম ছোট, মামলা ছোট; বাদী বিবাদী ধনী, তাই কৌঁসুলি আসিয়াছে—বিলাত হইতে সদ্য পাস-করা ব্যারিস্টার। বারুইপুর কলিকাতার নিকটে হইলেও, সে আমলে ব্যারিস্টার পথে ঘাটে দেখা যাইত না, অর্থাৎ দর্শনীয় ছিল। বিশেষ বাঙালী ব্যারিস্টার ছিল না বলিলেই হয়; তখনও বিলাতী বেকারের দল জন্মগ্রহণ করে নাই। কিন্তু সকলেই যে ব্যারিস্টার দেখিবার লোভে আসিয়াছে এমন বলা যায় না—ব্যারিস্টারের নাম তাহার বিলাত যাইবার আগে হইতেই অনেকে জানিত, অনেকে ছাত্রবৃত্তিতে তাঁহার রচিত কাব্য পাঠ করিয়াছে, রঙ্গমঞ্চে তাঁহার নাটক অভিনীত হইয়াছে; কোন কোন সংবাদপত্র ইঁহাকে মহাকবি বলিতে আরম্ভ করিয়াছে; ভদ্রলোক কবি ও ব্যারিস্টার। এই আপাতবিরোধের সন্নিবেশের জন্যই লোকে তাঁহাকে অদ্ভুত মনে করিত। তাই আজ ভিড় খুব বেশি।

যথাসময়ে হাকিম এজলাসে আসিয়া বসিলেন। হাকিমের বয়স বেশি নয়—ত্রিশের এদিকে; গায়ে কোট-প্যাণ্টালুন নয়, চোগা-চাপকান। একহারা চেহারা; ক্ষীণকায় বলিয়া যতটা দীর্ঘ তাহার চেয়ে বেশি মনে হয়; মাঝখান দিয়া চেরা সিঁথির দুই পাশে কুঞ্চিত সজ্জিত কেশদাম; প্রকাণ্ড ললাট, খড়্গের মত নাকটা চাপা অধরোষ্ঠের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে; উপরের ওষ্ঠ কিছু বড়, তাহার তলে অধর প্রায় অদৃশ্য—তবু মনে হয়, সর্ব্বদা একটা শুভ্র হাসির বিদ্যুৎ চারিপাশে খেলিতেছে। চোখ দুইটি তীক্ষ্ণোজ্জ্বল ও অনায়ত।

হাকিমকে দেখিয়া অনেকের মনে পড়িল, হাকিমও বড় কম নন; তিনিও খান দুই উপন্যাস লিখিয়াছেন, একখানা উপন্যাস তো এইখানে থাকিবার সময়েই প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা এত খবর রাখিত, তাহারা কবি ও ঔপন্যাসিকের মিলন দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এজলাসে ব্যারিস্টার প্রবেশ করিলেন। আত্মপ্রত্যয়বান বিখ্যাত অভিনেতা যে ভাবে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে সেই ভাবে; ব্যারিস্টার প্রবেশ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন, আজিকার রঙ্গমঞ্চের প্রধান অভিনেতা তিনি; হাকিম জবরদস্ত হইলেও তাহার প্রভাব আজ কিঞ্চিৎ ম্লান; তাঁহার মনে হইল, হাকিম এজলাস মামলা সবই উপলক্ষ্য, একমাত্র লক্ষ্য তিনি। তিনি যেন হাজার হাজার হাত হইতে অশ্রুত করতালির শব্দ শুনিতে লাগিলেন।

দর্শকেরা দেখিল যে, ব্যারিস্টার যে বিলাতী পাস করা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নেকটাই হইতে বুট পর্যান্ত আগাগোড়া বিলাতের ছাপ মারা; কেবল রংটিতে বাঙালিয়ানা বজায় রহিয়াছে। তবে যে শোনা যায়, বিলাতে বাস করিলেই রং ফর্সা হয়! ব্যারিস্টার স্থূলকায়। প্রৌঢ়ত্বের স্থূলতা দেহে দেখা দিয়াছে; মাথায় চেরা সিঁথি, চুল অনেকটা বিরল হইয়া পড়িয়াছে; গড়ানে ললাট, কোন সঙ্কল্প যেন দীর্ঘকাল সেখানে থাকিতে পারে না, দুইচার মুহূর্ত্ত টলমল করিয়া গড়াইয়া পড়িয়া যায়; নাকটা মোটা; অধরোষ্ঠ স্থূল ও ফাঁক, মনের কথা কিছুতেই যেন তাহারা চাপিয়া রাখিতে পারে না; চোখ উদার ও উজ্জ্বল; তাহারা কবির সংসার-জীবনের চঞ্চল সমুদ্রের ঊর্দ্ধে ধ্রুব-তারকার জ্যোতি বিকিরণ করিয়া অন্তরের কাব্য-সপ্তডিঙাকে যেন কমলে কামিনীর পরপারবর্ত্তী সুদূর সিংহলের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে।

হাকিম বুঝিতে পারিলেন—হাকিম হইলেও আজ তিনি উপলক্ষ্য; লক্ষ্য ওই কৌঁসুলি। জনতার মনোযোগ ও ঔৎসুক্য ওই কৌঁসুলিতে কেন্দ্রীভূত। তিনি স্থির করিলেন, কিছুতেই তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিবেন না, নেহাত দুই একটি ছাড়া কথাই বলিবেন না; কবি ও ঔপন্যাসিকের মধ্যে কে বড় সে বিষয়ে তর্ক থাকিতে পারে, কিন্তু এজলাসে কৌঁসুলির চেয়ে হাকিম বড়—তাহা প্রমাণ করিয়া দিবেন। তীক্ষ্ণোজ্জ্বল চোখ কাগজে নিবদ্ধ করিয়া অনুকম্পা-মিশ্রিত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তিনি যেন কৌঁসুলির তর্ক শুনিতে লাগিলেন।

অন্য পক্ষে ব্যারিস্টার যেন দর্শক সম্মুখে রাখিয়া অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন। সহস্র দর্শকের মধ্যে হাকিমও একজন। কখনও তিনি জনতার দিকে তাকাইতেছেন, কখনও হাকিমের দিকে, কখনও নিজের অত্যুগ্র বিলাতী পোশাকের দিকে। দুইজনের মধ্যে একজন স্বগত অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন, অপর জনের প্রাণপণ

চেষ্টা দর্শকের মনোরঞ্জন। কৌসুলির গলার স্বর মোটা, ভাঙা, বক্তৃতার মধ্যে আছে ইংরেজী কাব্যের কোটেশান, আছে ভারতচন্দ্রের তীব্র ব্যঙ্গোক্তি। হাকিম স্বল্পভাষী, স্বর পরিষ্কার, তীক্ষ্ণ ছিটেগুলির মত। কৌসুলি তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেন নাই ভাবিয়াই যেন হাকিমের অধরের পাশে একটা কৌতুকের হাসির আভাস।

হঠাৎ কাগজ হইতে একবার চোখ উঠাইতে দুইজনে চোখাচোখি হইয়া গেল। এতক্ষণের সঙ্কল্প ভুলিয়া, জনতা ভুলিয়া, স্থানকালপাত্র ভুলিয়া দুইজনে দুইজনের চোখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। উজ্জ্বল চোখের সঙ্গে উদার চোখের সম্মেলন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে স্নিগ্ধ দৃষ্টির, গদ্যের সঙ্গে পদ্যের, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে মধুসূদনের।

বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদন। একজন বিচারক, একজন ব্যারিস্টার। একজন কৃতী বিচারক, একজন ব্যর্থ ব্যারিস্টার—ইহা কি দৈব মাত্র, না তাহার অধিক কিছু ইহাতে আছে? বিচারকের ব্যক্তিত্ব লইয়াই যেন বঙ্কিমচন্দ্র আসিয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি ছিলেন নৈর্ব্যক্তিক, স্বল্পভাষী, স্বতন্ত্র; স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভেদী তাঁহার দৃষ্টি; উভয় পক্ষের তিনি ঊর্দ্ধে। মধুসূদন কৌসুলির কৌশল অবগত ছিলেন না; সুকৌসুলি নিজেকে উপলক্ষ্য করিয়া মক্কেলকে লক্ষ্য করিয়া তুলিবেন, তিনি হইবেন পরতন্ত্র। মধুসূদন দুইচার কথার পরে মক্কেলকে পটভূমিতে ঠেলিয়া দিয়া রঙ্গমঞ্চ নিজে অধিকার করিয়া দাঁড়াইতেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে মক্কেলের কথা ভুলিয়া যায়, সবাই দেখিতে থাকে বিস্ময়ের সঙ্গে মাইকেল এম, এস, ডাট—ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল-কে। অবশেষে অভিনয় অতি-অভিনয়ে দাঁড়ায়; লোকে ভুলিয়া যায় যে, লোকটা 'মেঘনাদবধ' নামে একখানা কাব্যের কবি; ভুলিয়া যায়, লোকটা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক; কেবল মনে রাখে, লোকটা কৌসুলি। কিন্তু যে কৌসুলি লোকের চক্ষে কৌসুলি ছাড়া আর কিছু নয়, বাক্-যবনিকা দ্বারা যে ওই অতি-প্রত্যক্ষ সত্যটাকে ঢাকিয়া দিতে না পারে, তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। যে অভিনেতা দর্শককে ভুলিতেই দিল না যে সে অভিনয় করিতেছে, তাহার প্রয়াস নিরর্থক।

মাইকেলের বৈশিষ্ট্য তাঁহার ঈষন্মুক্ত অধরোষ্ঠে; সে যেন সর্ব্বদা নীরব ভাষায় নিজের মনের কথা বলিয়া চলিয়াছে। সে ভাষণ চিঠিপত্রে, সনেটসমূহে, আত্মবিলাপে; সে বিলাপ রাবণের খেদোক্তিতে, এ'কেই কি বলে সভ্যতার নবকুমারের বক্তৃতায়, ভীমসিংহের সর্ব্বনাশী বিপদে; সে হাহাকার সুন্দ-উপসুন্দের তিলোত্তমা-লাভের উগ্র বাসনায়; তিলোত্তমা নবজাত কাব্যলক্ষ্মী, যাঁহার অন্য নাম তিনি দিয়াছিলেন মধুচক্র, সেই কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনা করিতে গিয়াই তাঁহার সর্ব্বনাশ; কবি-সত্তাই দ্বিধা-বিভক্ত সুন্দ-উপসুন্দ। মাইকেলের চোখের অচঞ্চল উদারতায় ও ওষ্ঠের ব্যগ্র বাচালতায় কত

প্রভেদ! চোখে তাঁহার প্রতিভা, ওষ্ঠে চরিত্র অর্থাৎ চরিত্রের অভাব। চরিত্র ও প্রতিভা, এই দুই পায়ের স্বাভাবিক গতি তিনি জীবনে লাভ করিতে পারেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য তাঁহার চাপা অধরোষ্ঠে, যে অধরোষ্ঠের উপরে ডিমোক্লিসের খড়্গের মত নাকটা ঝুলিতেছে। ওই চাপা ওষ্ঠ ভেদ করিয়া নিজের একটি কথাও তিনি বলেন নাই—বহু লোকের কথা বলিয়াছেন, কেবল নিজের ছাড়া। বঙ্কিমচন্দ্রের ওষ্ঠে নেতৃত্ব-শক্তির পরিচয়; কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে কোথায় সে বাহিনী, যাহাকে তিনি পরিচালনা করিবেন? কাজেই তিনি নিজেই এক অদৃশ্য বাহিনী রচনা করিয়া লইয়াছেন—মহেন্দ্র ও সন্তানের দল; রঙ্গরাজ ও ডাকাতের দল; সীতারাম ও সৈন্যের দল; প্রতাপ ও লাঠিয়ালের দল; রাজসিংহ ও রাজপুতের দল।

আমি মনশ্চক্ষে দেখিতেছি, ওই চাপা অধরোষ্ঠ ও উজ্জ্বল চক্ষু এই অদৃশ্য মানস-বাহিনীকে স্বল্পসঙ্কেত তর্জ্জনীর ইঙ্গিত করিতেছে! বঙ্কিমের ওষ্ঠে চরিত্রবল, নেত্রে প্রতিভা। বঙ্কিম ছিলেন নেতা, মাইকেল বক্তা; বঙ্কিম ছিলেন নৈর্ব্যক্তিক, মাইকেল ছিলেন অতি-ব্যক্তিক; বঙ্কিম ছিলেন যুধিষ্ঠিরের রথ, শূন্য দিয়া চলিতেন, চিহ্নটি মাত্র রাখেন নাই; মাইকেল ছিলেন কর্ণের রথ, ধরিত্রী ভেদ করিয়া তাঁহার যাত্রাপথের আর্ত্ত চিহ্ন। বঙ্কিম নিজের কথা কিছুই বলেন নাই, মাইকেল বেশি বলিয়াছেন; বঙ্কিম মাইকেল কাহারও জীবনী লিখিত হইবে না; একজনের বিষয়ে কিছুই জানি না, অপর জনের বিষয়ে অত্যন্ত বেশি জানি।

* * *

মাইকেলের ব্যারিস্টারি-ব্যবসা সম্বন্ধে নানা মত আছে; তবে একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে, যেমন তাঁহার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে ইহাতে অসামান্যতা লাভ করা অসম্ভব নয়, তেমনই তাঁহার মত চারিত্রিক স্থৈর্য্য যাহার অপ্রচুর, তাহার পক্ষে ইহাতে উন্নতি করা এক রকম অসম্ভব। আইন-ব্যবসায়ের সোনার খনির পথটা মরুভূমির সেই অঞ্চল দিয়া, যাহার দুই দিক মরীচিকার নদীতরঙ্গিত। মাইকেল যদি জীবনের দুই কোটিতে গুণ পরাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিতেন, তবে হয়তো ঘটনা অন্য দিকে মোড় ফিরিত; কিন্তু সরস্বতীর হাঁস ও লক্ষ্মীর পেচককে জুড়িয়া দিয়া পুষ্পকরথ চালাইতে তাঁহার বিষম প্রয়াস।

নিজের ঘরে যখন মামলা তৈয়ারি করিবার জন্য আইন অধ্যয়ন আবশ্যক, তখন তিনি সখী-সংবাদ শুনিতেন; সাহিত্যিক বন্ধুরা আসিলে আইনের বই ফেলিয়া রাখিয়া সাহিত্যালোচনা করিতেন; বন্ধুরা তাঁহার কাজের ক্ষতি হইতেছে মনে করিয়া উঠিতে চাহিলে তিনি ব্যাকুল হইয়া তাঁহাদের টানিয়া বসাইতেন।

একদিন মধুসূদন বার-লাইব্রেরিতে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীকে দেখিয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া নাট্যপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। এমন কি আদালত-গৃহে, জজের সম্মুখে আইনের নীরন্ধ্র দেওয়ালের মধ্যেও কবিতার বাসন্তিক বায়ু বহাইয়া দিতেন—

Like a Macharang stoops the plaintiff.

বারংবার লক্ষ্মীর পেচকের পরাজয় ঘটিতে লাগিল; সে প্রতিশোধের আশায় অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল—বেশি দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই।

ব্যারিস্টারি-জীবনের প্রথম বছরেই মাইকেলের মাসিক আয় দেড় হইতে দুই হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছিল—যে-কোন ভদ্র বাঙালীর পক্ষে এই আয় যথেষ্ট। কিন্তু যাঁহার ভদ্রভাবে জীবন-যাপনের মাসিক আদর্শ চল্লিশ হাজার টাকা, তাঁহার পক্ষে এ টাকা একান্ত অপর্য্যাপ্ত। বিশেষ, মধুসূদনের আয় অপেক্ষা ব্যয় বরাবর বেশি; হোটেলের সুদীর্ঘ বিল; মদ্যভাণ্ডারের অপরিমিত দান-সত্র; বিলাতের ঋণ; আর প্রতি মাসে স্ত্রীপুত্রদের জন্য ইউরোপে প্রেরণ তিন শত টাকা। মধুসূদনের ঋণ সুদে ও আসলে শনৈঃ শনৈঃ গোকুলে বাড়িতে লাগিল; তবে ভরসা এই যে, গোকুলটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহ।

মধুসূদনের হোটেলবাস সম্বন্ধে তাঁহার জীবনীলেখক বলিতেছেন—"স্পেনসেস্ হোটেলে মাইকেল মধুসূদন একাকী বাস করিতেন; কিন্তু তিনখানি বড় ঘর তাঁহার অধিকৃত ছিল। তিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে সতত পানভোজনে পরিতৃপ্ত করিতেন। দেশী বিলাতী, যিনি যেরূপ খানা খাইতেন, তিনি তাঁহাকে সেইরূপ খাদ্যদানে পরিতৃপ্ত করিতেন। তাঁহার মদ্যের ভাণ্ডার সতত উন্মুক্ত ছিল। হাইকোর্টের এটর্ণী, কৌন্সলি হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার নিজের সামান্য কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলকেই তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে মদ্যপানের নিমিত্ত অনুরোধ করিতেন। এমন কি, তাঁহার মুন্সী যখন কার্য্যান্তে বিদায় লইয়া যাইত, তখন তিনি বলিতেন—"Moonshi, don't go away; boy, give him a peg।" মধুসূদন যে মধুচক্র রচনা করিয়াছিলেন, গৌড়জন আনন্দে তাহার সুধা নিরবধি পান করিতেছিল।

কিন্তু অর্থে টান পড়িত; ইউরোপে যথাকালে টাকা পাঠানো হইত না; মধুচক্রের বিল মৌমাছির হুলের তীক্ষ্ণতা লাভ করিত; হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষের মসৃণ ললাটে ঝড়ের পূর্ব্বাভাস বহিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি দেখা দিত, তখন মাইকেলের মনে পড়িয়া যাইত—'মাই ডিয়ার ভিড'-কে।

"মাই ডিয়ার ভিড,

তুমি অপেক্ষাকৃত সুস্থ জানিয়া সুখী হইলাম, কারণ তোমাকে অনুকূলের কাছ হইতে ইউরোপের জন্য এক হাজার টাকা লইয়া দিতে হইবে। যদি তুমি আর দশজনের মত ব্যক্তি হইতে, তবে তোমাকে আমার জন্য এসব কাজে পুনরায় জড়াইয়া ফেলিতে দ্বিধা বোধ করিতাম। কিন্তু যদিও তুমি বাঙালী, তবু তুমি মানুষ, বন্ধুকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, আমার বিশ্বাস, তুমি সবই করিতে পার।...আমি যা রোজগার করি, সবই হোটেলের খরচে যায়—কারণ এখানে আমি ঋণী হইয়া থাকিতে চাই না।...যদি তুমি ২৫এ তারিখের ফরাসী ডাকের পূর্ব্বে এই টাকা সংগ্রহ করিতে না পার, তবে ইউরোপে তাহারা অনাহারে মারা পড়িবে।"

বাস্। শেষ ছত্রে অমোঘ বজ্র নিক্ষিপ্ত হইল।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়—তাহার পরেই সুদীর্ঘ এক প্যারাগ্রাফে এ-হেন সঙ্কটকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্ত্তব্য কি, সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এসব পত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে কি ভাব উদিত হইত, এক এক বার কল্পনা করিতে ইচ্ছা করে।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন—সংবাদ পাইয়া মধুসূদন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; কিন্তু পা মচকাইয়া নিজেও শয্যাশায়ী, যাইবার উপায় নাই—কাজেই একটি সনেট লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন—

"শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র!......

*　　　*　　　*

কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারম্বার।"

ক্রন্দনের অর্থ-নৈতিক হেতু যথেষ্ট আছে, কারণ মধুসূদনের ঋণ সংগ্রহের জন্যও অন্তত তাঁহার সুস্থ থাকা আবশ্যক। তবে এ সনেটের মূল ভাবটি কি? বেদনা, না খোশামোদ?

মধুসূদনের শেষজীবন অর্থের স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে পরিভ্রমণের ইতিহাস; অর্থের স্বর্ণমৃগও আয়ত্ত হইল না, কাব্যের সীতাও অপহৃত হইল।

একদিন মধুসূদন একটি নূতন মূল্যবান পোশাক পরিয়া আয়নার ছায়া দেখিয়া পাশের বন্ধুকে বলিলেন, "আমাকে কি বৰ্দ্ধমানের মহারাজার মত দেখায় না? এই উক্তির মধ্যে তাঁহার শেষজীবনের ইতিহাস গুপ্ত। মিল্টন হইবার স্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে—এখন তিনি বৰ্দ্ধমানের রাজত্ব কল্পনায় ভোগ করিতেছেন।

আর একদিন কৃষ্ণনগরাধিপতি সতীশচন্দ্রকে অনুসরণ করিতে করিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি কৃষ্ণচন্দ্রের পশ্চাতে ভারতচন্দ্রকে দেখিতেছি।" কবিপ্রতিভায় মধুসূদন

নিশ্চয় নিজেকে ভারতচন্দ্রের সমপর্য্যায়ে মনে করিতেন না—অনেক উচ্চে। তবে কেন নিজেকে ভারতচন্দ্র কল্পনা? কারণ ভারতচন্দ্রকে অর্থাভাবে পড়িতে হয় নাই। কৃষ্ণনগরের দত্ত সম্পত্তি তাঁহার ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনীলেখক লিখিতেছেন—

"একদিন মহারাজা কথাপ্রসঙ্গে মধুসূদনকে বলিলেন—এতদিন আমাদের ভারতচন্দ্র বঙ্গকবিদিগের মধ্যে প্রধান আসন অধিকার করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে সে আসন আপনি কাড়িয়া লইতেছেন।" এই কথায় মধুসূদন বলেন,—"আপনারা ভারতচন্দ্রকে ৩০০৲ টাকার গাঁতি দিয়াছিলেন, আমাকে কি দিবেন?" ইহা শুনিয়া মহারাজা সতীশচন্দ্র দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"আমার যদি কৃষ্ণচন্দ্রের মত সম্পত্তি থাকিত, আমি আপনাকে ৩০,০০০৲ হাজার টাকার জমিদারি দিতাম।"

বোধ হয় এমন রাজকীয় উক্তিতেও মধুসূদন সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, কারণ ত্রিশ হাজার টাকায় তাঁহার কি হইবে? চল্লিশ হাজার হইলে তবে ভদ্রভাবে জীবনযাপন করা যায়।

শেষবয়সে অর্থাভাবে পড়িয়া তিনি নিজেকে রাজকবি নিযুক্ত করিবার জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

গর্ব্বিতস্বভাব মধুসূদন এসব পরোক্ষ যাচ্ঞা কেমন করিয়া করিলেন? তবে কি অভাবের পীড়নে চিরকালের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল? না। এসব প্রার্থনাও তাঁহার অহঙ্কারের একটা প্রকাশ। ভাবটা এই রকম—"আমি সত্যকার প্রতিভাবান্ ব্যক্তি, তোমাদের আমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সাহায্য করিবার সুযোগ দিতেছি, যদি বুদ্ধিমান হও, গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হও।"

* * *

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে হেনরিয়েটা পুত্রকন্যাসহ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন মধুসূদন হোটেল ছাড়িয়া ৬নং লাউডন স্ট্রীটের প্রাসাদোপম বাড়িতে উঠিয়া আসিলেন।

লাউডন স্ট্রীটের বাড়িকে প্রাসাদ বলাই উচিত,—সুবৃহৎ অট্টালিকা, সুসজ্জিত কক্ষ, চারিদিকে সুন্দর উদ্যান ও লতাকুঞ্জ; ভাড়া মাসিক মাত্র চারি শত টাকা। এই বাড়িতে মধুসূদন ঋণ-করা টাকায় বিলাসের পেখম মেলিয়া দিয়া সপরিবারে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

কবির পাঠাগার ইউরোপ হইতে আনীত হোমার, দান্তে, ভার্জিল, টাসো, শেক্সপীয়র ও মিল্টনের আবক্ষ মূর্ত্তিতে সজ্জিত। সকালবেলায় এই পাঠাগারে কাব্যচর্চ্চা; দ্বিপ্রহরে অবশ্য আদালতে যাইবার একটা বিরক্তিকর উপলক্ষ্য আছে বটে, কিন্তু তাহার পরেই সন্ধ্যাবেলা বন্ধুমহলে 'গ্র্যাণ্ড ক্যারেজ' নামে প্রসিদ্ধ বিরাট অশ্বযানে সপরিবারে পরিভ্রমণ; রাত্রে বন্ধুদের লইয়া প্রকাণ্ড রাজকীয় ভোজ; প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের

পাচক প্রিন্স মাইকেলের প্রধান পাচক পদে অধিষ্ঠিত; ভোজান্তে পান; এ'কেই তো বলে সভ্যতা! ভদ্রভাবে জীবন যাপন! হাঃ হাঃ হাঃ—রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র গনিয়া টাকা খরচ করে না! কক্ষের চারিদিকের আবক্ষ পূর্ব্বসূরিগণ তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া পাথর হইয়া গিয়াছিলেন।

১৮৭০-এ তিনি প্রিভি কাউন্সিলের অনুবাদ-বিভাগের পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এই পদের মাসিক বেতন দেড় হাজার টাকা। কিন্তু দেড় হাজার তাতল সৈকতে বারিবিন্দু। আর গণিতশাস্ত্র যেমন নিরপেক্ষ, তেমনি নির্দ্দয়; আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য না ঘটাতে ঋণ বাড়িয়াই চলিল। আর সবচেয়ে বড় বিপদ এই যে, নূতন ঋণের পথ বন্ধ হইয়া আসিল। এমন কি বিদ্যাসাগরীয় অধ্যবসায়ও আর নূতন ঋণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না। মাইকেলের কাছে আয়ের অনেক উপায়ের মধ্যে ঋণও অন্যতম, এবং বোধ করি সহজতম; ঋণের পথ বন্ধ হওয়াতে সত্য সত্যই মাইকেল ভাঙিয়া পড়িলেন; দুর্দ্দম পাহাড়ী নদের, শরীর ও মনের দুই কূলে একসঙ্গে ভাঙন ধরিল।

পাওনাদারের ভয়ে তাহার বাড়ি হইতে বাহির হওয়া বন্ধ হইল; বাড়ি হইতে বাহির হওয়া বন্ধ হইবার সঙ্গে আয়ের পথ বন্ধ হইল। যে সব বন্ধুবান্ধব তাঁহার এই দুর্দ্দিনে কাজ লইয়া বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, কাজ করিয়া দিয়া মধুসূদন তাহাদের কাছে ফী লইতেন না, কিন্তু ঋণ লইতেন। একদিন এক বন্ধুর কাজ করিয়া দিলে তিনি ফী বাহির করিতে উদ্যত হইলেন। মাইকেল ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, সে কি! আমি তোমার কাছে ফী লইতে পারি না। তবে যদি আমার গৃহিণীকে পাঁচটি টাকা ধার দিতে পার, তবে ভাল হয়, ঘরে আজ এক পয়সাও নাই।

আবার রাধাকিশোর ঘোষ নামে এক বন্ধুর অনুরোধ না এড়াইতে পারিয়া তিনি পাওনাদারের ভয়ে পাল্কিবদ্ধ অবস্থায় আদালত পর্য্যন্ত যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ফিরিবার পথেও সেই পাল্কিবদ্ধ অবস্থা। রাধাকিশোর ঘোষ ফী দিতে চাহিলে মধুসূদন সম্মত হইলেন না; অবশেষে অনেক পীড়াপীড়িতে লইতে রাজি হইলেন—এক বোতল বার্গেণ্ডি, আধ ডজন বিয়ার ও এক শত মালদহের আম। এ রকম ঘটনা একটি দুইটি নয়; সপরিবারে অনাহারের সম্মুখে বসিয়া এমন ঘটনা নিত্যই ঘটিত।

কিন্তু আর চলে না; অবশেষে লাউডন স্ট্রীটের প্রাসাদ ছাড়িতে হইল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন সপরিবারে ইটালির বেনিয়াপুকুর রোডে উঠিয়া আসিলেন।

* * * *

এই সময় পঞ্চকোটের মহারাজা মধুসূদনকে নিজ রাজ্যের দেওয়ান-ম্যানেজার-

পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার পক্ষে এ পদ গ্রহণ করিবার প্রধান কারণ মনে হয়—এই উপলক্ষ্যে তিনি পাওনাদারদের কবল হইতে দূরে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু কোন দেশীয় রাজ্যে মধুসূদনের মত লোকের পক্ষে চাকুরি করা কি রকম সম্ভব, তাহা সহজেই অনুমেয়। অল্প দিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁহার গোলমাল আরম্ভ হইল; কয়েক মাস কাজ করিবার পরে তিনি বিরক্ত হইয়া চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এই চাকুরিতে তাঁহার একটি মাত্র প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য—তাহা মাইকেলের ইতিহাসবোধের পরিচায়ক; পঞ্চকোট-রাজ্যের প্রাচীন মন্দির মঠ প্রভৃতি রক্ষা করিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন।

* * *

সেপ্টেম্বর মাসে যখন তিনি পুনরায় ব্যারিস্টারি আরম্ভ করিলেন, তখন নানা-বিধ যন্ত্রণা দ্বিগুণিত বেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে—কণ্ঠনালী-প্রদাহ, প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি, জ্বর, রক্তবমন ও ঋণ; সপ্তরথীর ব্যূহ হইতে আর বাহির হইবার উপায় ছিল না।

পীড়ায় ব্যবসা বন্ধ হইল; আয় যতই কমিতে লাগিল, মানসিক চাঞ্চল্য ততই বাড়িতে লাগিল; আর মনে শান্তিলাভের জন্য সুরার মাত্রা চড়াইতে চড়াইতে মধুসূদন আত্মহত্যার সীমায় গিয়া পৌঁছিলেন।

একদিন দুপুরবেলা মনোমোহন ঘোষ মধুসূদনের বাড়িতে গিয়া দেখিলেন, মাইকেল সেই গরমে কক্ষের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া একাকী বসিয়া অগ্নিস্রাবী নির্জ্জলা সুরা পান করিতেছেন।

মনোমোহন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি করছেন? এর পরিণাম কি জানেন না?

মধুসূদন মরীয়া ব্যক্তির হাসি হাসিয়া বলিলেন, এরূপ মদ্যপান ও আত্মহত্যা যে একই, তা জানি; তবে কণ্ঠে অস্ত্রাঘাতের চেয়ে এতে ক্লেশ কিছু অল্প; **this is a process equally sure, but less painful.**

কক্ষের চারিধার হইতে অমর মৃতের দল নিস্তব্ধভাবে এই পাগলের কাণ্ড দেখিতে লাগিল।

মনোমোহন ঘোষ একটা জানালা খুলিয়া দিতেই নীচের তলার আঙিনা হইতে একদল পাওনাদারের সম্মিলিত ভর্ৎসনার ঐক্যতান ঘরে প্রবেশ করিল। মধুসূদন কেবল তপ্ত বাতাস রোধ করিবার জন্যই জানালা বন্ধ করেন নাই।

মধুসূদন মৃত্যুব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এক এক দিন রক্তবমনে বড় বড় পাত্র পূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু কে কাহার কথা শুনে! কে তাঁহাকে উপদেশ দিবে, আর

কে সেই উপদেশ গ্রহণ করিবে! এমন কি, যে বন্ধুবাৎসল্য মধুসূদনের সহজাত বলিলেও চলে—এই উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে তাহারও পরীক্ষা হইয়া যাইত। রামকুমার বিদ্যারত্নকে মধুসূদন অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি এহেন অবস্থা দেখিয়া একদিন নিভৃতে তাঁহাকে সুরাপান ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। মধুসূদন বলিলেন, পণ্ডিত, আমি তোমাকে অতিশয় ভালবাসি, কিন্তু এরূপ অনুরোধ আর ক'র না। এরূপ করলে আমার সঙ্গে তোমার আর কোনও সম্বন্ধই থাকবে না।

ইহা যে মৃত্যুব্রতীর উক্তি!

কিন্তু ঋণীর বিশ্রামের সুযোগ কোথায়? সেই অসুস্থ শরীরেই একটি মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে তাহাকে ঢাকা যাইতে হইল। সেখানকার অধিবাসীরা একটি সভায় কবিকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করিয়াছিল; মধুসূদনও ঢাকা নগরীকে সম্বোধন করিয়া একটি সনেট লিখিয়াছিলেন।

মাচ মাসে তাঁহার পীড়ার যন্ত্রণা অতিশয় বাড়িয়া উঠিল, সঙ্গে উত্তমর্ণগণের তাগিদও ছিল। তাহারা আর ধৈর্য্য ধরিতে চায় না; চোখের সম্মুখে অধমর্ণের জীবনশেষ লক্ষ্য করিলে কোন্ উত্তমর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে।

মধুসূদন একজন উত্তমর্ণকে তাঁহার বাড়ির চেয়ার, টেবল, আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া তাহার প্রাপ্য শোধ করিয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। আর একজনকে বলিলেন, তাঁহার পাঠাগারের মহাকবিদের মূর্ত্তি ও তাঁহার লাইব্রেরির গ্রন্থগুলি নীলামে চড়াইয়া প্রাপ্য শোধ করিয়া লইতে। আবার অন্য একজনকে নিজের অপ্রকাশিত রচনাসমূহ দান করিতে উদ্যত হইলেন, মুন্সী, আমার কতকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা আছে, সেগুলি তুমি গ্রহণ কর, সে সব ছাপলে নিশ্চয় তোমার ঋণ পরিশোধ হবে।

ইহা মরীয়া ব্যক্তির বিশ্বজিৎ যজ্ঞ; যাইবার আগে কিছুই আর বাকি রাখিবেন না; জীবনে মরণে দেউলিয়া হইবার উৎকট উল্লাসে যে উন্মাদ, ইহা তাহারই উক্তি।

* * *

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন 'হেক্‌টর-বধ কাব্য' প্রকাশ করিলেন; এই গ্রন্থখানি ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত, উৎসর্গ-পত্রে কবি বলিতেছেন—

"প্রায় চারি বৎসর হইল, আমি শারীরিক পীড়িত হইয়া, এমন কি ৩।৪মাস স্বকর্ম্মে হস্তনিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম; সময়াতিপাতার্থে উরুপাখণ্ডের ভগবান কবিগুরুর জগদ্বিখ্যাত ইলিয়াড নামক কাব্য সদাসর্ব্বদা পাঠ করিতাম। পাঠের সময় মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইল যে, এ অপূর্ব্ব কাব্যখানির ইতিবৃত্ত স্বদেশীয় ইংলণ্ড-ভাষানভিজ্ঞ জনগণের গোচরার্থে মাতৃভাষায় লিখি; লিখিত পুস্তকখানি চারি বৎসর মুদ্রালয়ে পড়িয়া ছিল; এমন সময় পাই নাই যে, ইহাকে প্রকাশি।"

মধুসূদনের সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে 'হেক্‌টর-বধ' সর্ব্বাপেক্ষা অনাদৃত ও অপঠিত। বাংলা গদ্যকে যে নূতন পথে তিনি চালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্বাস্থ্য ও সময়ের অভাবে তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। যদি তিনি সুস্থ ও জীবিত থাকিয়া 'হেক্‌টর-বধে'র অনুরূপ কিন্তু উচ্চতর গদ্য-রীতিতে আরও দুই-চারিখানি গদ্য-কাব্য রচনা করিতে পারিতেন, তবে নিঃসন্দেহে বাংলা গদ্যরীতি নূতন একটা পথ কাটিয়া লইত।

মেঘনাদবধের পূর্ব্ববর্ত্তী তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে যেমন অপরিণত অমিত্রচ্ছন্দ, হেক্‌টর-বধেও তেমনই অপরিণত গদ্যছন্দ; তিলোত্তমাসম্ভবের পরে মেঘনাদবধ পাইয়াছি, তাই অমিত্রচ্ছন্দের পরিণাম জানি; হেক্‌টর-বধের পরে অন্য গদ্য-কাব্য না পাওয়াতে তাহার পরিণাম কি হইতে পারিত জানি না। তবে এ কথা ঠিক যে, মাইকেল সে পথ খুলিয়া দিলে তাহাতে পথিকের অভাব হইত না; বিশেষ বাংলা গদ্য-রচনায় ক্রিয়াপদ লইয়া পদে পদে যে গোল বাধে, মাইকেলী প্রতিভার ষ্টীম-রোলার তাহার উপর দিয়া একবার চলিয়া গেলে, সে বাধা অনেক পরিমাণে সুগম হইয়া যাইত। মাইকেল বাংলা পদ্যে নামধাতুর বহুলপ্রচার করিয়া দিয়া যে উপকার করিয়াছেন, হেক্‌টর-বধের গদ্যরীতি প্রচলিত হইলে, গদ্যে সেই জাতীয় সমস্যার বহুকালের জন্য সমাধান হইয়া যাইত।

মাইকেল যখন বিশেষ অসুস্থ, তখন বেঙ্গল-থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে 'মায়া-কানন' ও 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে দুইখানি নাটক রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন; রচনায় মাইকেলী প্রতিভার বিশেষ চিহ্ন নাই; কেবল নাম দুইটিতে তাহার শেষজীবনের অদৃষ্টের পরিহাসের ইঙ্গিত যেন বর্ত্তমান—'মায়া-কানন', 'বিষ না ধনুর্গুণ'!

এই সময়ে কয়েকটি স্কুলপাঠ্য নীতি-কবিতা তিনি রচনা করিয়াছিলেন; ছাত্রজনোচিত যে নীতিই এগুলিতে থাকুক, লেখকের পক্ষে প্রধানত এগুলি অর্থনীতিমূলক। মাইকেলের প্রবর্ত্তিত কাব্যের অনেক ধারাই আজ বাংলা সাহিত্যে চলিতেছে। শেষজীবনে স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনার রীতি তন্মধ্যে অন্যতম; তখন হইতে প্রথম শ্রেণীর কোনও লেখক ইহার ব্যতিক্রম করেন নাই।

মাইকেলের জীবনের শেষভাগে লিখিত সকল কবিতাতেই কেবল অর্থের স্বপ্ন, যে অর্থ প্রতিদিন অধিকতরভাবে তাঁহার আয়ত্তাতীত হইয়া যাইতেছিল।

পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রীর প্রতি—

"হেরিনু রমারে আমি নিশার স্বপনে;"

বার—

"ভেবেছিনু, গিরিবর! রমার প্রসাদে,
তাঁর দয়াবলে—"

পঞ্চকোটগিরির বিষাদ লক্ষ্য করিয়া কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"কোথায় সে রাজলক্ষ্মী যাঁর স্বর্ণজ্যোতি
উজ্জ্বলিত মুখ তব ?"

ঢাকাবাসীদের অভিনন্দনের উত্তরে যে সনেটটি কবি লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও এই ঐশ্বর্যের স্বপ্ন—

"শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।
প্রতিঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকি এইখানে)
নিত্য-অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।"

নীতি-কবিতার অধিকাংশেও এই অনায়ত্ত বাস্তব ঐশ্বর্য্যের স্বপ্নরূপ—

"বঙ্গ এদেশের নাম বিখ্যাত জগতে,
ভারতের প্রিয় মেয়ে
মা নাই তাহার চেয়ে
নিত্য অলঙ্কৃত হীরা মুক্তা, মরকতে।"

আবার নেহাত দরিদ্র গদাও পথে যাইতে যাইতে দেখিল—

"থল্যে এক পথেতে পড়িয়া।
দৌড়ে মূঢ় থল্যে তুলি
হেরে কুতুহলে খুলি
পূর্ণ থল্যে সুবর্ণ মুদ্রায়,
তোলা ভার, এত ভারী তায়।"

যকৃতের রোগীর মত মাইকেল চারিদিক সুবর্ণের পীতবর্ণে লাঞ্ছিত দেখিতেছিলেন। অনায়ত্ত ঐশ্বর্য্যের লোভ এমন একটা বাতিকে দাড়াইয়াছিল যে, তাহা জীবন ছাড়িয়া মাইকেলের কাব্যলোক পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল।

ঢাকা, পঞ্চকোট যখনই যেখানে তিনি গিয়াছেন, এই ভাবটা বেশি করিয়া তাঁহার মনে পড়িবাছে যে, আর সকলেই সম্পন্ন, ধনবান, তিনিই কেবল দরিদ্র।

বঙ্গভূমিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"অতল দুঃখ-সাগরের জলে
ডুবিনু, কি যশঃ তব হবে বঙ্গস্থলে ?"

ঢাকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি !"

আবার স্বপ্নে রমা কবিকে পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রীকে দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন—

"বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জন্মান্তরে,
তেঁই দেখা দিলা তোরে আজি হৈমবতী
যেরূপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে
পঞ্চকোট ; পঞ্চকোট—ওই গিরিপতি।"

জীবনের প্রথমার্দ্ধে যেমন কাব্যলক্ষ্মীকে বশে আনিবার জন্য মধুসূদনের মানসিক ভারকেন্দ্র বিপর্য্যস্ত, শেষার্দ্ধে তেমনই আবার তাঁহার ভারকেন্দ্র বিপর্য্যস্ত—অর্থলক্ষ্মীকে বশ করিবার জন্য। মাঝখানে সামান্য চার পাঁচটি বছরের জন্য মাইকেলের জীবনের ভারকেন্দ্রে সমতা আসিয়াছিল। তখন লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়েই ধরা দিয়াছিলেন। মানুষের মত দেবতারাও অনেক সময়ে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিলে ধরা দেন না, দূরে দাঁড়াইয়া নিষ্ঠুর কৌতূহলে হাসিতে থাকেন।

* * *

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মধুসূদন সপরিবারে উত্তরপাড়ার জমিদারের লাইব্রেরি-ভবনে আসিয়া কিছুকাল ছিলেন। স্থানটি নির্জ্জন, গঙ্গার উপরেই। কলিকাতার কোলাহল ও অশান্তি নাই। উত্তমর্ণদের পক্ষে এতদূরে আসা সব সময়ে সম্ভব নয়। কিন্তু সংসারে অনবচ্ছিন্ন সুখ কোথায়? উত্তরপাড়াতেও ডাকঘর আছে—উত্তমর্ণদের চিঠি আসিতে লাগিল। আর তাহার ভাষা এমন নয় যে, গৌড়জন সুধা মনে করিয়া পান করিতে পারে।

মধুসূদন ১৮৬৯-এ আর একবার এখানে আসিয়াছিলেন। আজ নিশ্ছিদ্র দুঃখের অন্ধকারে সেদিনের সুখদুঃখের গোধূলির আলোআঁধারির কথা মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িল, একদিন হেনরিয়েটা পিয়ানো বাজাইতেছিলেন, শর্ম্মিষ্ঠা একটি ইংরেজী গান গাহিতেছিল, আর কবি স্বয়ং পিয়ানোর উপরে কনুয়ের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া তন্ময় হইয়া ছিলেন; প্রশস্ত কক্ষ উচ্ছ্বসিত সুরের ইন্দ্রজালে ভরিয়া গেল; হঠাৎ কখন্ মাতার কণ্ঠ কন্যার সঙ্গীতে যোগ দিল; মধুসূদন শর্ম্মিষ্ঠাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঘরময় নৃত্য করিয়া ফিরিতে লাগিলেন; তাঁহার দুই চোখ দিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে আজ অনেক দিনের কথা; জীবন তখন এমন কৃপণ ভাব ধারণ করে নাই; আজ দেউলে হইবার প্রান্তে বসিয়া কবির সেই দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল।

উত্তরপাড়াতে মধুসূদনের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা গেল না। সারাদিন নির্জ্জীবের মত শয্যাশ্রয় করিয়া তিনি রক্তবমন করিতেন। যখন উঠিতে পারিতেন, ছাদের উপরে গঙ্গার হাওয়ায় একাকী পায়চারি করিয়া বেড়াইতেন—আবার ফিরিয়া আসিয়া শয্যাগ্রহণ করিতেন।

এই সময়ে মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়, ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহারাণী

স্বর্ণময়ীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন। এই প্রশংসা মধুসূদনের অহঙ্কারের একটা রূপান্তর; বাস্তবের অপরিশোধিত ঋণকে প্রশংসা দ্বারা পরিশোধের চেষ্টা। অহঙ্কারী লোক কাহারও কাছে ঋণী থাকিতে চায় না।

গৌরদাস প্রায়ই বন্ধুকে দেখিতে যাইতেন। "একদিন গৌরদাস্ গিয়া দেখিলেন, শয্যাশায়ী মধুসূদনের মুখ দিয়া রক্ত গড়াইতেছে, তিনি রোগযন্ত্রণায় অধীর হইয়া হাঁপাইতেছেন—আর তাঁহার পত্নী জ্বরঘোরে ভূতলে লুণ্ঠিতা। গৌরদাসকে গৃহে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, অতি কষ্টে মধুসূদন একটু উঠিয়া বসিলেন, প্রবলবেগে অশ্রু নির্গত হইয়া তাঁহার গণ্ড ও বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নিজের যন্ত্রণা অপেক্ষা পত্নীর শোচনীয় অবস্থা মধুসূদনের পক্ষে সমধিক মর্ম্ম-পীড়াদায়ক হইয়াছিল। পত্নীর রোগযন্ত্রণা দেখিয়া নিজের যম-যন্ত্রণা ভুলিয়া মধুসূদন অধীর ও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাই গৌরদাসকে দেখিয়াই মধুসূদন কেবল মাত্র বলিয়া উঠিলেন—**afflictions in battalions!** তৎপরে গৌরদাস যখন অবনত হইয়া অভাগিনী হেন্‌রিয়েটাকে দেখিতে গেলেন, তখন চিরপতিপ্রাণা সাধ্বী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন—'আমাকে ছাড়িয়া উঁহাকে দেখুন, উঁহার শুশ্রূষা ও যত্ন করুন, আমি মরিতে ভয় করি না'।"

দুঃখের চিত্র হিসাবে ইহাই যথেষ্ট; বোধ করি যথেষ্টেরও বেশি; কিন্তু বাঙালী জীবন-চরিতকারের কলমের কালি ও চোখের জল এত অল্পে নিঃশেষ হইবার নয়। স্বামী-স্ত্রীর দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া শিশু দুইটির কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে; তাহাদের দিয়া পর্য্যুষিত অন্ন খুঁটিয়া আহার করাইয়া তবে তিনি ছাড়িয়াছেন; এবং সপরিবারের এই চারি স্তম্ভের উপরে নীতি-উপদেশের ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান রচনা করিয়া বেত্র-হস্ত হেড-মাস্টারের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই যে, মধুসূদন সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন। তাঁহার চোখে ইহাই মধুসূদনের সব দুঃখদুর্দ্দশার মূল—যাহাকে বলে ওরিজিন্যাল সিন।

পরদিন কবি সপরিবারে সুচিকিৎসার জন্য কলিকাতায় নীত হইলেন।

* * *

হেন্‌রিয়েটা বাঙালী কাব্যরসিকদের উপেক্ষিতা। তাঁহাকে আমরা কতটুকু জানি! মধুসূদনরূপী পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার উদয়—আবার মধুসূদনরূপী পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার অস্ত। মাঝে দুই একবারের জন্য চন্দ্র মেঘাবৃত হইলে সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল তারকা আমাদের চোখে পড়ে। এই কয়েকটি ক্ষণিক দর্শনের স্মৃতির সমষ্টি হেন্‌রিয়েটা। কোন প্রথম শ্রেণীর বাঙালী সাহিত্যিকের এমন পত্নীভাগ্য হইয়াছে কি না সন্দেহ।

মধুসূদন উগ্র ব্যক্তিত্ব ও বিরাট প্রতিভার দ্বারা আমাদের চিত্ত ও দৃষ্টি এমন

আকর্ষণ করেন যে, আর কাহারও দিকে তাকইবার অবকাশ থাকে না। যাঁহার প্রতিভার দীপ্তিতে তৎকালীন বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের পর্য্যন্ত কিয়ৎপরিমাণে ছায়াশরীরী বলিয়া মনে হয়;—ভূদেব ছায়াশরীরী ব্যর্থ-উপদেশ-বর্ষণকারী; বিদ্যাসাগর ছায়াশরীরী নব-নব-ঋণ-সন্ধানকারী; রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন যাঁহার যাত্রাপথের ধর্ম্মধ্বজাবহনকারী; গৌরদাস যাঁহার তৃপ্তি-সহকারে আহারের জন্য কাঁটা চামচ সন্ধানে ব্যস্ত; 'পুওর মন্ত' গ্রীষ্মের দুপুরে মদ্যপানরত ব্যক্তির কক্ষের জানালা খুলিবেন কিনা দ্বিধাগ্রস্ত; যতীন্দ্র-মোহন গ্রন্থ-মুদ্রণের বিল শোধে আনন্দিত; আর পাইকপাড়ার রাজারা রঙ্গমঞ্চ সাজাইতে-ছেন, প্রতি মুহূর্ত্তে শঙ্কিত, কখন প্রধান অভিনেতা আসিয়া উপস্থিত হয়! এহেন বিরাট পুরুষের ব্যক্তিত্বের উগ্র আলোতে হেন্‌রিয়েটা যে এক আধ বারের জন্যও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন, ইহাই বিস্ময়ের।

কেবল দুই বার হেন্‌রিয়েটা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, দুই বারের দুইটি ঘটনায়; একবার যখন তিনি অনাহারের মুখ হইতে পুত্রকন্যাকে ছিনাইয়া লইয়া স্বামীর উদ্দেশে বাংলা দেশ ছাড়িয়া ইউরোপ যাত্রা করেন, তখন; আবার যেদিন তিনি ইউরোপ হইতে আসন্ন অনাহার সবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া পুত্রকন্যাদের লইয়া স্বামীর উদ্দেশে কলিকাতায় রওনা হন, সেইদিন। প্রখর ব্যক্তিত্ববতী রমণী ছাড়া এ দুইটি ঘটনা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। কিন্তু দুই বারই ঘটনাক্ষেত্রে মধুসূদন অনুপস্থিত; তাঁহার উপস্থিতিতে হেন্‌রিয়েটার ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি সব বিলীন হইয়া যাইত—স্বামীর বিরাটতর ব্যক্তিত্বের মধ্যে। আর উগ্র ব্যক্তিত্ব-বান পুরুষেরা, বোধ করি, প্রখর ব্যক্তিত্ববতী পত্নী পছন্দ করে না। মধুসূদন করিতেন না, জানি—কি জীবনে, কি কাব্যে।

প্রমীলা ব্যক্তিত্ববতী রমণী, কিন্তু মেঘনাদের সমক্ষে সে লতার ন্যায় সুকুমার, কোন রকম দৃঢ়তা তাহার চরিত্রে আছে, বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু মেঘনাদের অবর্ত্তমানে সেই প্রমীলা যখন লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিতেছে, তখন তাহার প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব হীরকের দ্যুতিতে ও কাঠিন্যে চোখ ঝলসাইয়া প্রকাশমান। মেঘনাদ প্রমীলার ব্যক্তিত্বের প্রখরতা সহ্য করিতে পারিত না; কারণ মেঘনাদের স্রষ্টারও তাহা সুসহ ছিল না।

মধুসূদনের অন্তিম লগ্নে এক আধ বার হেন্‌রিয়েটাকে চোখে পড়ে, মধুসূদনের সামীপ্য সত্ত্বেও চোখে পড়ে, কিন্তু তখন মধু-প্রতিভা মৃত্যুর আসন্ন স্পর্শে ম্লান; অস্তাসন্ন চাঁদের আলোয় ক্ষণভাস্বর সন্ধ্যাতারা! কিন্তু দুইজনেরই অন্তক্ষণ সমাগত—এক দিগন্তের চিতাতেই উভয়ের সহমরণ।

* * *

মধুসূদন ও হেন্‌রিয়েটা বেনিয়াপুকুর রোডের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু রোগ

কমিল না; তখন বন্ধুরা চিকিৎসার যোগ্যতর ব্যবস্থার জন্য হেন্‌রিয়েটাকে জামাতা ফ্লয়েড সাহেবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া মধুসূদনকে আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করিলেন।

মধুসূদনের ব্যাধি নিরাময় হইবার নয়; যে কয়দিন তিনি এখানে ছিলেন, কিছু পরিমাণে স্বস্তি অনুভব করিয়াছিলেন—উপযুক্ত চিকিৎসায়, যোগ্যতর শুশ্রূষায়, এবং বোধ করি, হাসপাতালে উত্তমর্ণদের প্রবেশের নিয়ম না থাকায়।

ব্যাধির প্রকোপ যখন কম থাকিত, মধুসূদনের স্বভাব প্রকাশ হইয়া পড়িত; সেই হাস্যরসজ্ঞান ও বাক্‌পটুতা, সেই নির্ম্মল সখ্য, সেই উচ্ছ্বসিত কাব্যালোচনা, সেই আশৈশবের স্বধারি। একজন ভক্ত তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া গিয়া যোগ্যতরভাবে চিকিৎসার প্রস্তাব করিয়াছিল, মধুসূদনের সম্মতি ছিল না। লোকটি তাঁহাকে রাজি করিবার জন্য কান্নাকাটি শুরু করিল; মধুসূদন গম্ভীরভাবে তাহাকে বলিলেন, "তুমি এখানে ওরূপ বালকের ন্যায় কান্না ও গোলযোগ ক'র না; এ সাহেবদের হাঁসপাতাল।"

আরও তাঁহার স্বভাব প্রকাশ হইয়া পড়িত সেই আজন্মের অকুণ্ঠিত ঋণ-গ্রহণে। শুশ্রূষাকারিণীকে কিছু দিবার জন্য মুন্সীর কাছে মধুসূদন ঋণ চাহিলেন, "তোমার কাছে কিছু আছে কি?"

যাহা ছিল লইয়া অত্যন্ত উদারভাবে তিনি শুশ্রূষাকারিণীর হাতে দান করিলেন, "Here is something for you"

বাঁচিবার আশা নাই জানিয়া মধুসূদন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন তাহার কাছে খ্রীষ্টান-জনোচিত অন্তিম স্বীকারোক্তি করিলেন; খ্রীষ্টের প্রতি অগাধ বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার করুণার উপরে নির্ভর করিয়া তিনি মরিতেছেন, জানাইলেন।

২৬এ জুন হেন্‌রিয়েটার মৃত্যু হইল। সমাধি-ব্যাপার শেষ করিয়া গভীর রাত্রিতে মনোমোহন ঘোষ, 'পুওর মনু', মধুসূদনকে সংবাদ দিতে গেলেন।

মধুসূদন আগেই খবর পাইয়াছিলেন, এখন মনোমোহনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মনোমোহন, সকল তো ভদ্রোচিতভাবে সম্পন্ন হয়েছে? কোন ত্রুটি হয় নি তো? কে কে উপস্থিত ছিলেন? বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্র ও দিগম্বর উপস্থিত ছিলেন কি?"

মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, "সবই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে, কোন ত্রুটি হয় নি। বিদ্যাসাগর প্রভৃতিকে সংবাদ দেবার সময় হয় নি।"

আষাঢ়ের দুর্য্যোগময়ী রাত্রি; বাহিরে অবিরাম ঝড় ও বৃষ্টি; বহুকাল পূর্ব্বে, বহুদূরের এক পার্ব্বত্য প্রদেশে, ম্যাক্‌বেথের প্রাসাদ-ভবনের বাহিরেও এমনই দুর্য্যোগময়ী রাত্রি ছিল সেদিন; শেক্‌স্পীয়রের নাটকের মধ্য দিয়া ঝঞ্ঝার সেই আর্ত্তনাদ কানে প্রবেশ করিতে লাগিল। সদ্যপত্নীবিযুক্ত মাইকেল চমকিয়া উঠিলেন, নিজেকে ম্যাক্‌বেথ

মনে হইল—ম্যাক্‌বেথ ছাড়া আর কি? ম্যাক্‌বেথের মতই তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভাঙিয়া পড়িয়াছে; একদাশোভন জীবনের উপকূল আজ প্রেতচ্ছায়াময়। হেন্‌রিয়েটা সত্যসমাহিত; বেদনার বিদ্যুদালোকে নিদারুণ অদৃষ্টের সঙ্গে আজ মুখামুখি সাক্ষাৎ—আর বাহিরের দারুণ দুর্য্যোগে যেন অন্তরের প্রতীক নিরন্তর ঝঙ্কিত।

"তুমি তো শেক্সপীয়র পড়েছ, সেই কয়টি পংক্তি কি তোমার স্মরণ হয়?"

মনোমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কয়টি পংক্তি?"

"লেডি ম্যাক্‌বেথের মৃত্যুতে ম্যাক্‌বেথের উক্তি! আমার স্মৃতি লুপ্ত হয়ে আসছে, কোন কথাই আর স্মরণ হয় না।"

এই বলিয়া তিনি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day
To the last syllable of recorded time,
... ...
... ... out, out, brief candle!
Life's but a walking shadow... .."

মনোমোহন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন; মধুসূদন ডাক্তারের মুখে অবধারিত মৃত্যুর কথা শুনিয়াছেন, তিনি শান্ত হইবেন কেন? তিনি মনোমোহনকে বলিলেন, "এখন আমার শেষ অনুরোধ যে, আমার পুত্র দুটি তোমার পুত্রদের সঙ্গে যেন অন্ন পায়; তবে আমি নিশ্চিন্ত মনে প্রাণত্যাগ করিতে পারি।"

মনোমোহন বলিলেন, "আমি অঙ্গীকার করছি, যদি আমার পুত্রগণ এক মুষ্টি অন্ন পায়, তবে তারা আপনার পুত্রদের না দিয়ে কখনও আহার করবে না।"

"God bless you, my boy."

মনোমোহন বিদায় হইলেন।

* * * *

প্রতি মুহূর্ত্তে রাত্রি গভীরতর ও প্রকৃতি ভীষণতর হইতে লাগিল। হাসপাতালের স্তিমিত আলোক, মুমূর্ষুর স্তিমিততর মস্তিষ্কে, জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্তিম উগ্রতায় স্মৃতির শোভাযাত্রা চালনা করিতে লাগিল। লেডি ম্যাক্‌বেথের মৃত্যুর সেই উক্তি ক্রমে বাস্তবতর হইয়া উঠিল—out out, brief candle! জীবনের জীর্ণজ্বরের অবসানে সাহিত্যিক ম্যাক্‌বেথ! অসম্ভব উচ্চাকাঙ্ক্ষার ডাকিনীরা কোন্ দুস্তর জীবন-মরুভূমির মধ্যে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে! ব্যাঙ্কোর উত্তরপুরুষদের ছায়াবাহিনীর মত এ কাহাদের ছায়ামূর্ত্তি-মেখলা তাঁহার মনোমুকুরে উদ্ভাসিত!

অন্ধ কবি মিল্টন !

"কালিদাস, ভার্জিলের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব, কিন্তু মিল্টন ? অসম্ভব !"

মেঘনাদবধ নামে একখানা সদ্যপ্রকাশিত কাব্য হাতে মধুসূদন দত্ত।

"ইহা কি আমাকে অমরত্ব দান করিবে না, রাজনারায়ণ ?"

কৃষ্ণচন্দ্রের অনুসরণে ভারতচন্দ্র।

"তুমি খুব করিয়াছ, কিন্তু ভারতচন্দ্রকে ছাড়াইতে পারিয়াছ, মনে হয় না।"

"আঃ, কৃষ্ণনগরের সেই লোকটা !"

ইংলণ্ডের রাজকবি লর্ড টেনিসন।

"বর্দ্ধমানের মহারাজা কি আমাকে রাজকবি করিবেন না ?"

সমুদ্রের মধ্যে একবিন্দু দ্বীপ—ইংলণ্ড না সিংহল ?

"I sigh for Albion's distant shore"

"সতত, হে নদ, মোর পড় তুমি মনে।"

মাইকেল এম. এস. ডাট, ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল অব গ্রেজ ইন ! হাঃ হাঃ হাঃ।

'পুওর মনু'—আই. সি. এস. ফেল !

চটি চাদরে মাই ডিয়ার ভিড !

"শুনিনু নিদ্রায় আমি, নিকুঞ্জ কাননে
মনোহর বীণাধ্বনি।"

অর্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়ন-পথে উত্তমর্ণগণের তীব্র ভর্ৎসনা !

'মায়া-কানন', না 'বিষ না ধনুর্গুণ !'

"চল্লিশ হাজার টাকার কমে ভদ্রভাবে জীবন-যাপন করা যায় না।"

"আমার পুত্র দুটি যেন তোমার পুত্রদের সঙ্গে অন্ন পায়।"

মেঘনাদবধ-কাব্য, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা।

রাশি রাশি অপরিশোধিত বিল !

অমরত্ব ও ঐশ্বর্য্যের দুই কোটির অসম্ভবের সাধনায় সদ্যভগ্ন জীবনের হরধনু !

Out, out, brief candle !

* * * *

২৯এ জুন রবিবার বেলা দুইটায় মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু হইল।